আহলে হাদীসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ

অনুবাদ ও সংকলন
রুহুল্লাহ নোমানী

আহলে হাদীসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ

অনুবাদ ও সংকলন
রুহুল্লাহ বিন মোস্তফা নোমানী
তাকমীল: দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
অধ্যয়নরত: ইফতা প্রথম বর্ষ, অত্র জামেয়া।
০১৯১৮-০০৪৩২৩, ০১৭২৩-৩০৭০২২
ruhullahnumani@gmail.com

সহযোগিতায়
মুফতী আতিকুর রহমান, ঢাকা

প্রকাশক ও পরিবেশক
আল-মাকবাতুত তাওফিকিয়্যাহ
(জামেয়ার শাহী গেটের সামনে)
ডাকবাংলো রোড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
০১৯৩৩-০৮২৬৩৬, ০১৬৮২-৩০৬৭২১

কম্পোজ ও প্রচ্ছদ
আল-মুঈন কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স।
জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০১৭২২-৫৫২৭৫১, ০১৭২২-৪৪৬০৪০

তারিখ-০১/০৬/২০১২ইং

মূল্য-......... টাকা

সংক্ষিপ্ত সূচীঃ

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

আহলে হাদীসের প্রতি পাল্টা চ্যালেঞ্জ

🕮 আহলে হাদীসের প্রতি ১০০ প্রশ্ন

🕮 মাযহাব ও নামায সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: انما الاعمال بالنيات و انما لامرء ما نوى- فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرءة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه- متفق عليه -

ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত,
রাসূল ﷺ বলেছেন-আমল ভাল কিংবা
মন্দ হওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি
ভাল কিংবা মন্দ, সে যা নিয়ত করবে শুধু তাই পাবে।
সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করল,
সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হিজরত করল। আর যে
ব্যক্তি দুনিয়া অর্জনের জন্য কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ
করার জন্য হিজরত করল, তার হিজরত ঐ বস্তুর
জন্যই হল, যে জন্য সে হিজরত করেছে।
(বুখারী ও মুসলিম)

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

কয়েকটি কথা

সর্ব প্রথম:

হামদ আল্লাহ তায়ালার জন্য। যিনি খালিক ও মালিক এবং রহমান ও রহীম। যিনি সৃজন করেছেন মানবরূপে, হেদায়েত দিয়েছেন নবী পাঠিয়ে, শরীয়ত দিয়েছেন মানার জন্য, বিবেক দিয়েছেন বুঝার জন্য এবং রিজাল দিয়েছেন অনুসরণের জন্য। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। সালাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি। যার সম্পর্কে - **وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى-** অবতীর্ণ হয়েছে। যার মুখনিসৃত **لا تجمع أمتى على الضلالة - أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم** এবং **الحمد لله الذي وفق لرسول رسوله لما يحب و يرضى** ইত্যাদি বাণীসমূহ উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আলোকবর্তিকা।

সালাম সে মহান রিজালের প্রতি, যারা প্রাত: স্মরণীয়। যারা অনুসরণীয়। যাদের উক্তি ও ব্যাখ্যার আলোকে মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে। যারা মাযহাবের মাসআলা-মাসায়িল ব্যাখা- বিশ্লেষণ করেছেন এবং আহলে সুন্নতের সকল ব্যক্তি ও মনীষীর উপর। আল্লাহ সকলের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আমীন।

কিতাব সর্ম্পকে:

কিতাবটি, চারটি কিতাব ও কিতাবাংশের সমন্বিতরূপ। যথা-

➲ **১২ মাসআলা: ২০ চালেঞ্জ ও ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার**

এটি আল্লামা মুনীর আহমদ মুলতানী রচিত *بارہ مسائل بیس لاکھ انعام*এর অনুবাদ । লিখক আহলে হাদীসের সাথে বিতর্কিত নামায সংক্রান্ত ১১টি এবং দু'হাতে মুসাফাহা, মোট ১২টি মাসআলার নিরপেক্ষ সন্তোষজনক সমাধান পেশ করেছেন। আহলে হাদীসের প্রতি হাদীস বিষয়ক ২০টি চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। সাথে দিয়েছেন ২০ লক্ষ টাকা অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ। প্রারম্ভিকায় লিখেছেন আহলে হাদীসের সাথে বিতর্কের ৮টি মূলনীতি, ৫টি মুনাযারা। বিতর্কের টিপ্‌সগুলো জোকের মুখে ঠিক নুনের মতো।

➲ **আহলে হাদীসের প্রতি পাল্টা চ্যালেঞ্জ**

এটি আহলে হাদীসের স্বঘোষিত মুজতাহিদ মাওলানা হুসাইন বাটালভী সাহেবের চ্যালেঞ্জের জওয়াবে লিখিত শায়খুল হিন্দ রহ. এর *ادلۂ کاملہ* এর পাল্টা চ্যালেঞ্জ অংশের অনুবাদ। চ্যালেঞ্জদাতা মাওলানা হুসাইন বাটালভী সাহেব আমৃত্যু ১০ পাল্টা চ্যালেঞ্জের জওয়াব দিয়ে যেতে পারেননি। ১৪৪ বছর পরে তার মানষপুত্রেরা হয়তবা সফল হবেন। তাই চ্যালেঞ্জগুলো তাদের সমীপে পেশ করা হল।

➲ **আহলে হাদীসের প্রতি ১০০ প্রশ্ন**

এটি আল্লামা আমীন ছফদার রহ. রচিত *غیر مقلدین سے دو سو اور علمائے غیر مقلدین سے چار سو سوالات* থেকে নির্বাচিত ১০০ প্রশ্নের অনুবাদ। এতে ইমাম বুখারী রহ., বুখারী শরীফ এবং তাকলীদ সম্পর্কে তাদের কথা ও কাজের ১০০ অমিল সনাক্ত করে দেয়া হয়েছে। হয়তবা তারা জওয়াব দিয়ে বাধিত করবেন।

➲ **মাযহাব ও নামায সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা।**

এটি আল্লামা মোস্তফা নোমানী দা.বা. রচিত 'একশত মাসআলা শিক্ষা' (চতুর্থ খন্ড) থেকে মাযহাব সংক্রান্ত ৫টি ও নামায সংক্রান্ত ৪টি, মোট ৯টি মাসআলার সংকলন। অধ্যয়নে আপনি-মাযহাব সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের উত্তর এবং আহলে হাদীসের অযথা বাড়া-বাড়ি কালে আপনার করণীয় সম্পর্কে একটি সুন্দর দিক নির্দেশনা লাভ করবেন।

❒ পরিশিষ্টে অত্র কিতাবে উল্লিখিত পারিভাষিক শব্দসমূহের ব্যাখ্যা লিখে দেয়া হয়েছে। যাতে শাস্ত্রীয় পরিভাষা সম্পর্কে অনবগতির কারণে কোন প্রকার জটিলতার সম্মুখীন হতে না হয়।

❒ পুরো সংকলনটি সকলের জন্য একটি অনন্য তোহ্‌ফা। অধ্যয়ন শেষে একজন কট্টর আহলে হাদীসের মাঝেও অনুভূতি সৃষ্টি হবে। সাধারণ আহলে হাদীস সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন। আর আহলে সুন্নতের লোকেরা আহলে হাদীসের বিভ্রান্তি নিরসনের প্রয়োজনীয় রসদ পেয়ে যাবেন। ইনশা আল্লাহ।

কৃতজ্ঞতা:

আমার আব্বা-আম্মা, চার লিখক এবং যারা অভিমত দিয়েছেন। আমার সকল আসাতিযা, আত্মীয়-স্বজন এবং যারা দু'আ করেছেন। বন্ধু ও সহপাঠীদের থেকে আনাস, আরমান, জাবের, বেলাল এবং যাদের সামান্য সহযোগিতাও রয়েছে। সকলের প্রতি অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে কৃতজ্ঞতা এবং শুভ কামনা। আতিক ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে কোন অকৃতজ্ঞও ভুল করবেনা। আল্লাহ সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

পাঠক সমীপে:

যে কোন কিতাবেই ভুল থাকতেই পারে, তবে আনাড়ী অনুবাদকের কিতাবে অনেক বেশি আছে। তাই অন্যরা অভিহিত করার আবদার করলেও অধম সংকলকের এ সাহসটুকু নেই। হ্যাঁ, যিনি অনুগ্রহ করবেন, তার ঋণে আবদ্ধ থেকে যাব।

অনুবাদের রীতি ও ভাষা পাঠকের সামনেই রয়েছে। দৈন্যতা সত্ত্বেও পাঠকের উদারতার উপর ভরসা করেছি। বিয়োজন সাধারণত করিনি। সংযোজনগুলো বেষ্টনীবন্দি সাধারণত করে দিয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে মূল কিতাবের উর্দূ তরজমার অনুবাদকালে হাদীসের মতনও সংযোগ করেছি। তবে সেগুলো চিহ্নিত করে দেইনি। হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় শুধু মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত অংশটুকুর অনুবাদ করেছি। অনেক সময় ভাব ঠিক রেখে ভাষার সংকোচনও করেছি। হাজার ভুলের সাথে ক্ষমা প্রাপ্তির প্রবল আশাই কিতাবটি আপনার হাতে এনে দিয়েছে।

আহলে হাদীস বন্ধুদের প্রতি:

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি আপনার সামনে রয়েছে। সোনালী যুগ সর্ম্পকেও আপনি অবগত। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতি এবং ইসলামের মূলনীতির আলোকে ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত ও উপযোগী কর্মসূচীই কাম্য। দাওয়াত অবশ্যই কল্যাণের দিকে এবং দাবী অবশ্যই বাস্তবতার নিরিখে হতে হবে।

তাকলীদ ও মাযহাব বিতর্কের কোন প্রসঙ্গ হতে পারেনা। কারণ এমন কেই নেই যার কোন মাযহাব নেই এবং যিনি তাকলীদ করেন

না। যারা মাযহাব ও তাকলীদের বিরোধিতা করছেন, তারাও মাযহাব মানার কারণে ও তাকলীদ করার কারণেই করছেন।

আহলে হাদীসও একটি স্বতন্ত্র চিন্তাকেন্দ্র। তথা মাযহাব বিরোধিতার ছদ্মবেশে পঞ্চম মাযহাব। তাকলীদ অস্বীকারের অন্ত রালে অনিবার্য তাকলীদ। মাযহাবই তাদের পুজি। তাকলীদই তাদের প্রেরণা। তাদের হাদীস সম্ভারের পরিধি প্রত্যক্ষবাদী আলেমদের বেধে দেয়া সীমানা পর্যন্ত। তাদের মাসআলা-মাসাইলের অবস্থাও তথৈবচ। একজন নবদীক্ষিত আহলে হাদীস কিভাবে দ্বীন মানছেন? ঐ মাযহাবে আহলে হাদীস ও তাকলীদে ওলামায়ে হাদীসের আলোকেই। অর্থ্যাৎ মাযহাব ও তাকলীদকে তালাক দিয়ে, তার যমজ বোনকে বিবাহ করা।

সুতরাং মাযহাব ও তাকলীদই যেহেতু শেষ গন্তব্য, হাজারো বছরের স্বীকৃত নিয়ম ও সমাদৃত নিযাম বর্জনের ফায়দা কী? মুসলমানদের এহেন ক্রান্তিলগ্নে নতুন বির্তক সৃষ্টি, পঞ্চম মাযহাবের উদ্ভব কি খুবই জরুরী? আমাদের নির্বুদ্ধিতা যদি শত্রুকে সুযোগ করে দেয়, তাহলে আপনাকে-আমাকে একত্র হয়েই কাঁদতে হবে। তাই আসুন মাযহাব নয়, দ্বীন কায়েম করি। বিদ্বেষ নয়, বন্ধন গড়ে তুলি।

মুসলমান ভাইদের প্রতি:

তাসবীর মালাটি যেন ছিড়ে গেছে। তাই একের পর এক ফিৎনা দানাগুলোর মতই ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ কোরআন মানে তো হাদীস মানে না, কেউ হাদীস মানে তো ফিকহ মানে না, কেউ রাসূল মানে তো সাহাবা মানে না। এ রকম অসংখ্য, অগণিত। তবে বুদবুদ বেশিক্ষণ টিকে না। তাই অনেক ফিৎনা বেঁচে আছে ইতিহাসের পাতায়, অনেক সেখান থেকেও হারিয়ে গেছে। তবে খালি করে গেছে নতুন ফিৎনা জন্ম লাভের জায়গা।এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। সাথে একদল খাটি আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত থাকবে। যারা সাহাবায়ে কেরামকে দলীল মানে না, তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত হতে পারে না। তাদের ধোঁকা থেকে সাবধান থাকতে হবে।

ঢাল-তলোয়ারহীন মুসলমানের ভয়ে বিশ্ব কেন যেন শংকিত। তাই প্রয়াস চালাচ্ছে- মুসলমাদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে শংকামুক্ত থাকার জন্য। অভিমান হয় সে সব মুসলমানদের উপর যারা বুঝে- না বুঝে

তাদের ফাঁদে পা দিয়ে কলহ সৃষ্টি করছে। তাদেরকে বুঝানো, বুঝতে না চাইলে প্রতিহত করা, অন্তত নিজে বেঁচে থাকা সকলের দায়িত্ব। তাই সাধ্যমত নিজের আমলের দলীল সর্ম্পকে অবগত হওয়া, তাদের আঘাতের জওয়াব জেনে নেয়া, আগুন জ্বালালে নিভানোর যোগ্যতা অর্জন করা সময়ের দাবী। এজন্য আলেমগণের সরণাপন্ন হওয়া, কিতাবাদি অধ্যয়ন করা, দ্বীন সম্পর্কে জানা এবং জানানো, বুঝা এবং বুঝানো একান্ত প্রয়োজন। দুনিয়ার জন্য এত কিছু করলেন, দ্বীনের জন্য কি সামান্যও করবেন না!

তরুণ আলেম ভাইদের প্রতি:

প্রবীণরা তো তাদের করণীয় করে যাচ্ছেন, সামনে সময় আমাদের। কিন্তু চোখ মুদে সামনে তাকালে হাজারো ফিৎনার ঘনঘটা দেখা যায়। একটির আঘাত অন্যটির তুলনায় অনেক ভয়াবহ। সময়ের পূর্বে প্রস্তুতি না নিলে, সময় মত পস্তাতে হবে। ইতিহাস স্বাক্ষী নির্লিপ্ততা আমাদের কত ক্ষতি করেছে। আমাদের শুধু প্রতিহত করলেই চলবেনা, সামনেও এগুতে হবে। ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য-উদারতার পাহাড়ও চাই, সাগরও চাই। তাই অগ্রজ-অনুজ সকলের কাছে আবদার- আমরা যেন অবহেলা না করি। যারা ময়দানে আছেন, তাদের শানিত হতে হবে। যারা নেই, তাদের এগিয়ে আসতে হবে। আমরা মানযিলে মাকসূদে পৌঁছবই। ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ যেন সকলের সাথে অধমকেও কবুল করেন। আমীন।

পরিশেষে:

সমস্ত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে রাসূলের সীরাত, সাহাবাগণের আদর্শের উপর অটল ও অবিচল রাখেন। সকলের মনে ইমাম ও আলেমগণের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করে দেন। আপনের মাঝে দ্বন্দ্বে না জড়িয়ে শত্রুর সামনে দাঁড়ানোর তাওফীক দান করেন। আমীন।

বিনীত,
রুহুল্লাহ নোমানী
তাং- ০৩/০৬/১৪৩৩হিজরী

দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদীস, বেফাকুল মাদারিস আল-আরাবিয়া এর চেয়ারম্যান, আলেমে রব্বানী, শায়খুল ইসলাম **আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা. বা.** এর-

অভিমত ও দু'আ

نحمده و نصلي على رسوله الكريم - أما بعد

হক বাতিলের দ্বন্দ চিরন্তন। তবে যুগে যুগে সত্যের অনুসারীরা বাতিলকে প্রতিহত করেছে। বাতিল যেভাবে এসেছে তাকে সেভাবেই প্রতিহত করা হয়েছে। শেষ জামানায় এসে আমাদেরকে একত্রে অনেকগুলো ফিৎনার মোকাবালা করতে হচ্ছে। অমুসলিমদের পাশা-পাশি অনেক মুসলিম ব্যক্তি সংগঠন, দলও ইসলামের নামে ফিৎনা করছে। এক সঙ্গে সকলের মোকাবালা করতে হবে। আল্লাহ তাওফিক দান করবেন।

প্রচলিত ফিৎনাহসমূহের মাঝে আহলে হাদীস একটি অন্যতম ফিৎনা। তারা হাদীস অনুসরণের নাম দিয়ে উম্মাহর মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। হানাফীরা নাকি হাদীস মানেনা। আমি তাদেরকে বলব- আমরা তো হাদীস ঠিকই মানি বরং তোমরাই হাদীস মান না। তোমরা যয়ীফ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার কর। মূলতঃ হাদীস অনুসরণের নাম ভাঙ্গিয়ে হাদীস তরক করাই তাদের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তারা ছদ্ম নাম ধারণ করেছে।

এ সম্পর্কে আমার স্নেহস্পদ ছাত্র রুহুল্লাহ নোমানী কর্তৃক অনূদিত ও সংকলিত 'আহলে হাদীসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ' কিতাবটি অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে। সে কয়েকটি কিতাব অনুবাদ ও সংকলন করে স্পষ্ট করে দিয়েছে, তাদের আহলে হাদীস নাম ধারণের অন্তরালে কত অসত্য লুকিয়ে আছে। কিতাবটি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করলে তাদের নাম ও কামের মাঝে চরম অমিল স্পষ্ট হয়ে যাবে। মোছাফাহা ও নামায সংক্রান্ত মাসআলাসমূহে সম্পূর্ণ ইতমিনান হাসিল হবে। বুখারী শরীফ, ইমাম বুখারী ও তাকলীদ সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহ এবং শায়খুল হিন্দ রহ. এর পাল্টা চ্যালেঞ্জ থেকে তাদের অসারতা সর্ম্পকে স্পষ্ট ধারণা লাভ হবে।

দু'আ করি আল্লাহ লিখক, অনুবাদক ও পাঠকসহ আমাদের সকলকে কবুল করুন। এ সব ফিৎনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন

(আহমদ শফি)
১৬/০৭/১৪৩৩হিজরী
০৭/০৬/২০১২ইংরেজী

আহলে হাদীস সম্প্রদায় ও অত্র কিতাব সম্পর্কে বরেণ্য আলেম ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা **আল্লামা মোস্তাফা নোমানী** সাহেব দা.বা. এর–

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم - نحمده ونصلي علي رسوله الكريم - أمابعد

আমার বড় ছেলে রুহুল্লাহ নোমানী (ফাজেলে দারুল উলূম হাটহাজারী) কর্তৃক অনূদিত ও সংকলিত 'আহলে হাদীসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ' যা চারটি কিতাবের অনুবাদ ও সংকলন। **'১২ মাসআলা: ২০ চ্যালেঞ্জ ও ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার'**-লিখক আল্লামা মুনীর আহমদ মুলতানী, **'আহলে হাদীসের প্রতি পাল্টা চ্যালেঞ্জ'**- লিখক শায়খুল হিন্দ রহ., **'আহলে হাদীসের প্রতি ১০০ প্রশ্ন'**- লিখক আল্লামা আমীন ছফদার রহ. ও আমার একটি বই থেকে **'মাযহাব ও নামায সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা'**। কিতাবটি আমি অত্যন্ত মনযোগ সহকারে আগা গোড়া পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছি।

সুন্নাত ও হাদীস, শব্দ দুটি মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উক্তি, কর্ম ও অনুমোদনকে বুঝায়। কিন্তু আহলে সুন্নাত ও আহলে হাদীস এ দু'টি পরিভাষার মধ্যে বর্তমানে আসমান ও যমীন বরাবর পার্থক্য রয়েছে। 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' বলতে ঐ লোকদেরকে বুঝায়, যারা (১) আল্লাহর কোরআন (২) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস (৩) সাহাবাগণের জামায়াত বা ইজমা ও (৪) মাযহাবের ইমামদের কিয়াস– এ চারটিকে শরীয়তের দলীল মানে। আর আহলে হাদীস বলতে ঐ লোকদেরকে বুঝায় যারা আল্লাহর কোরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসকে দলীল মানতে রাজি আছে। কিন্তু সাহাবী ও মাযহাবের ইমামদেরকে দলীল মানতে রাজি নয়। এতে নাকি শিরক হয়। এজন্য তারা নিজেদের নাম রেখেছে আহলে হাদীস। নামের শেষে ওয়াল জামায়াত" অংশটুকু শিরক ও বিদয়াত হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছে।

ইরানের শিয়ারা তো আযানের মধ্যে أشهد أن محمدا رسول الله - এর পরে শ্রেষ্ঠ চার সাহাবীর মধ্যে- أشهد أن عليا خليفة الله - বলে অন্তত: একজন খলীফায়ে রাশেদকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু আহলে হাদীসের ভাইয়েরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস (তাও আবার শুধু ইমাম বুখারী রহ. এর লিখিত সহীহ বুখারী শরীফের হাদীস) ছাড়া অন্য কাউকে দলীল মানতে রাজি নয়।

তিনি মাযহাবের ইমাম তো দূরের কথা চার খলীফার কেউ হলেও কাজ হবে না। যেমন–

(১) দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রা. তাঁর শাসনামলে মহিলাদেরকে মসজিদের জামায়াতে যোগদান করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। সাহাবীরা রা. তাঁর এ উদ্যোগকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু এ যুগের আহলে হাদীসরা বলেন, আমরা ওমর রা. কে মানি না। তিনি আমাদের নবী নন। আমরা নবীর হাদীস মানি। নবীর হাদীসে নিষেধ নেই। এ জন্য তাদের মসজিদে মহিলারাও জামায়াতে শরীক হয়ে থাকে।

(২) হযরত ওমর রা., হযরত ওসমান রা. ও হযরত আলী রা. এ তিন খলীফার শাসনামলে সাহাবীরা রা. তারাবীহ নামায ২০ রাকাআত পড়ে থাকলেও এবং চার মাযহাবের ইমামগণ এ ২০ রাকাআতের কথা বললেও কাজ হবে না, তারা তারাবীহ নামায ৮ রাকাআত পড়বে।

(৩) তৃতীয় খলীফা ওসমান রা. জুময়ার দ্বিতীয় আযান চালু করেছেন। সকল সাহাবী ও ইমামগণ মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তারা মানবে না। তাদের আযান একটি।

মোট কথা, নবীর হাদীস কেবল মাত্র তারাই ঠিকমত বুঝেছেন। সাধারণ সাহাবীরা তো দূরের কথা, শ্রেষ্ঠ সাহাবী খলীফারাই বুঝেননি (نعوذبالله)। আর ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক রহ. প্রমুখ ইমামগণ হাদীস বুঝবেন কিভাবে, তখন তো সহীহ বুখারী রচিতই হয় নি। এজন্য মাযহাবের ইমামগণ কিয়াস দ্বারা আল্লাহর দ্বীনকে টুকরা টুকরা করেছেন (نعوذبالله)।

কিন্তু আপনারা এ বইটি পড়লে বুঝবেন যে, তারা কত বড় ভ্রান্ত! আমি আশা করি এ বইটি তাদের স্বরূপ উন্মোচন করে দিবে। তাই দোয়া করি বইটি শীঘ্রই প্রকাশিত হোক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন লিখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠক– সকলকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জায়াতের আকীদার উপর মজবুত থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত

মোস্তফা নোমানী
মাইঠা চৌমহনী
বরগুনা সদর।

২৮শে রবিউস সানী /১৪৩৩
২২শে মার্চ / ২০১২

বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ, জামেয়া ওবায়দিয়া নানুপুরের সিনিয়র মুহাদ্দিস ও হাদীস বিভাগীর প্রধান, আল্লামা জমিরুদ্দীন রহ. এর সুযোগ্য সাহেবজাদা, গ্রন্থপ্রণেতা ও গবেষক **আল্লামা কুতুবুদ্দীন নানুপুরী দা.বা.** এর দৃষ্টিতে-

'যা বলতে হয়'

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم- اما بعد

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র মনোনীত ও সংরক্ষিত দ্বীন। আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুযে যুগে বহু ধরণের বাতিল ও বহুমুখি ফিৎনা এ সংরক্ষিত দ্বীনকে দুনিয়ার বুক থেকে নি:শেষ করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। কিন্তু সবগুলোই নিপাত যাবে, আর ইসলাম ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

আমাদের দেশে নামধারী আহলে হাদীসরা সে বহুমুখী ফিৎনার শিকলের একটি কড়ি। তারা নিজেদের কে "আহলে হাদীস" নামে পরিচয় দিয়ে সরলমনা মানুষদের ধোঁকা দিচ্ছে এবং তাদের ঈমান-আমল ধ্বংস করার পায়তারা করছে।

আহলে হাদীস নামে তারা বাস্তব আহলে হাদীসের জন্য কলঙ্কের কারণ। বাস্তব আহলে হাদীসের জন্য তিনটি গুণের প্রয়োজন। ১. হাদীসের জ্ঞান থাকা। ২. রিওয়ায়াতের মাধ্যমে হোক বা লিখনির মাধ্যমে হোক, হাদীস সংরক্ষণ করা। ৩. হাদীস অনুযায়ী আমল করা।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.– যার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের জমানার আহলে হাদীস বন্ধুগণও চলার চেষ্টা করে – বলেন

نحن لا نعنى باهل الحديث المقتصرين على سماعه او كتابه او روايته بل نعنى لهم كل من كان احق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه ظاهرا وباطنا-

অর্থঃ কেবলমাত্র শুনা, লেখা অথবা বর্ণনায় সীমাবদ্ধ ব্যক্তিদেরকেই আহলে হাদীস বলা হয় না। বরং আমাদের নিকট আহলে হাদীস বলতে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের বুঝায়, যারা হাদীস সংরক্ষণ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থ অনুধাবন করার যোগ্যতা সম্পন্ন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থের অনুসারী তথা আমলকারী হবেন। (দেখুন: নক্বদুল মানতিন-পৃ:১৮)

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য ভাল করে অনুধাবন করলে উল্লিখিত তিনটি গুণ স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়।

আর বর্তমান আহলে হাদীসদের মাঝে তিনটি গুণ তো দূরের কথা একটি পাওয়াও দুষ্কর। কারণ-

প্রথম গুণ ছিল হাদীসের জ্ঞান থাকা। আর এ গুণটি তাদের মধ্যে বিদ্যমান না থাকার অনেক প্রমাণ রয়েছে। তন্মধ্য হতে সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক. অনেক প্রসিদ্ধ মাসআলা যা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত, যেমনঃ নামায ক্বাজা করার মাসআলা, বিনা অজুতে কুরআন স্পর্শ করা মাকরূহ হওয়ার মাসআলা, নাভির নিচে হাত বাঁধার মাসআলা, নিচু স্বরে আমীন বলার মাসআলা, এ ধরণের আরো অনেক মাসআলা যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। তারা এগুলি হাদীসে নেই বলে আখ্যা দিয়ে অস্বীকার করে। যদি হাদীসের জ্ঞান তাদের থাকতো, তাহলে এভাবে অস্বীকার করার দুঃসাহস করতো না।

খ. অনেক বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসকে যঈফ বা বাতিল বলে উড়িয়ে দেয়। যদি তাদের হাদীসের জ্ঞান থাকতো, তাহলে এ রকম লাগামহীন কাজ করতে পারতো না।

গ. তারা মনে করে, বুখারী ও মুসলিমের বাইরে ছহীহ হাদীস নেই। থাকলেও তা বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের সমতুল্য নয়। যদি তাদের হাদীসের জ্ঞান থাকতো, তাহলে তারা এ ধরণের মূর্খতাসুলভ কথা বলতে পারতো না। ইমাম বুখারী রহ. স্বয়ং বলেন-

ما ادخلت فى كتابى الجامع الا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول-

অর্থ- আমি আমার আল্-জামী' গ্রন্থে শুধু ছহীহ্ হাদীস এনেছি। তবে গ্রন্থের কলেবর বড় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অনেক ছহীহ হাদীস ত্যাগ করেছি। (দেখুন: তারীখে বাগদাদ-২/৮,৯)

অনুরূপ ইমাম মুসলিমেরও বক্তব্য রয়েছে। লম্বা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তা উল্লেখ করলাম না। তাদের এ বক্তব্যগুলি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বুখারী ও মুসলিমের বাইরে অসংখ্য ছহীহ হাদীস রয়েছে।

দ্বিতীয় গুণ ছিল, তা'লীম, রিওয়ায়াত বা লিখনীর মাধ্যমে হাদীসকে সংরক্ষণ করা। আর এই গুণটি তাদের মধ্যে মোটেও নেই। কারণ হাদীসের সনদ অনুসন্ধান করলে, তাদের আক্বীদা ভিত্তিক কোন ব্যক্তিকে

হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এমনকি তাদের আক্বীদাহ ভিত্তিক লোকদের নির্ভরযোগ্য লেখিত কোন হাদীসের কিতাব বা রিজাল শাস্ত্রের কিতাব অথবা উছূলে হাদীসের কিতাব পাওয়া যায় না। অতএব সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তাদের দ্বারা হাদীস সংরক্ষণের কোন কাজ অতীতে পাওয়া যায়নি।

আর বর্তমানে তাদের দ্বারা হাদীস সংরক্ষণ তো দূরের কথা। বরং তারা হাদীসকে ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত আছে। যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, তাদের মতবাদ বিরোধী হলেই তারা অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসকে যঈফ বা বাতিল বলে উড়িয়ে দেয়। বরং এমনও দেখা গেছে যে, তাদের মতবাদ বিরোধী হাদীসকে কিতাব থেকে বাদ দিয়ে কিতাব ছাপিয়ে প্রকাশ করেছে। যেমন মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বা থেকে তারা নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদীসকে বাদ দিয়ে ছাপিয়েছে, পরে যামানার মুহাক্কিক মুহাম্মদ আওয়ামা তাদের এ ধোঁকাবাজী বুঝতে পেরে, আবার তাহ্কীক করেন এবং সে কিতাবের আসল পাণ্ডুলিপিগুলি যাচাই-বাচাই করে সে বিলুপ্ত হাদীস অন্তর্ভূক্ত করে কিতাবটিকে পূণরায় মুদ্রণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

তো যারা এ ধরণের হাদীস বিধ্বংসী কাজে লিপ্ত তারা আবার আহলে হাদীস দাবি করে কিভাবে?

তৃতীয় গুণটি ছিল, হাদীস অনুযায়ী আমল করা, এ গুণটিও তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে নেই। কারণ তারা বিনা অজুহাতে অনেক হাদীস অনুযায়ী আমল করতে অস্বীকার করে। যেমন- সাহাবীগণের ফজীলতপূর্ণ হাদীস, "তাঁরা যে উম্মতের জন্য সত্যের মাপকাঠি" সে সমস্ত কথা যে হাদীসগুলোতে উল্লেখ আছে, তার উপর তারা আমল করে না। কারণ তারা সাহাবীগণকে সত্যের মাপকাঠি মানে না। বরং তাঁদের ব্যাপারে বিভিন্ন কটুক্তি ও খারাপ মন্তব্য করে থাকে।

অতএব সুস্পষ্ট জানা গেল যে, আহ্লে হাদীস হওয়ার জন্য যে তিনটি গুণের প্রয়োজন, তাদের মধ্যে একটিও পরিপূর্ণভাবে নেই। তাহলে তারা কিভাবে আহলে হাদীস দাবি করে?

তারা আহ্লে হাদীস নয়, আহলে হাদীসের নামে কলঙ্ক। বাস্তব আহলে হাদীস হলো, চার মাযহাবের আলেমগণ। তাঁদের মধ্যে এ তিনটি গুণ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। যা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশের নামধারী আহলে হাদীস উম্মতের জন্য একটি বড় ফিৎনা।

১. তারা সাহাবীদেরকে সত্যের মাপকাঠি মানে না। বরং তাঁদের সমালোচনা করে ও তাঁদের সম্বন্ধে বিভিন্ন কটুক্তি করে। (দেখুন, তাদের কিতাবঃ নুযূলুল আবরার ২/৯৪, হিদায়াতুল মুহতাদী-১/৯৬, কাশফুল হিজাব-পৃঃ ২১, আশ্‌রাফুল জাদি পৃঃ ১০১, ২০৭)

অথচ সাহাবীদেরকে সত্যের মাপকাঠি মানা ও সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করা আহলে হক্বের পরিচয়।

২. ফিক্বহ শাস্ত্রকে তারা অস্বীকার করে। অথচ স্বর্ণযুগ থেকে তা স্বীকৃত। সে যুগ থেকে আলেমগণ ফিক্বহ শাস্ত্রের আলোকে নিত্য-নতুন সমস্যার সমাধান দিয়ে আসছেন এবং ফিক্বহবিদগণ সে ব্যাপারে বড়-বড় কিতাব লিখেছেন। আর মুহাদ্দিসগণ হাদীসের কিতাবসমূহে ফিক্বহের গুরুত্বের উপর অধ্যায় রেখেছেন।
৩. ইজমা-ক্বিয়াসকে তারা অস্বীকার করে। অথচ সে দু'টিও আহ্লে হক্বের পরিচয়। সাহাবাদের স্বর্ণযুগ থেকে এ দু'টির প্রচলন। এদু'টি ছাড়া কুরআন-হাদীস থেকে মাসআলা বের করে সব সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব নয়।
৪. সলফদের ব্যাপারে বিভিন্ন কটূক্তি করে ও মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে। বিশেষ করে ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্বন্ধে খুব খারাপ মন্তব্য করে। আর এটি ক্বিয়ামাতের আলামত হতে একটি। রাসূল ﷺ ক্বিয়ামতের আলামত বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন-

ولعن آخر هذه الامة اوله فلير تقبوا عند ذالك ريحا حمراء او خسفا او مسخا-

অর্থ- ক্বিয়ামতের আর একটি আলামত হলো যে, এই উম্মতের পরের লোকেরা আগের লোকদেরকে অভিশাপ করবে। এরপর ইরশাদ করেন যে, যখন এই আলামত পরিলক্ষিত হবে, তখন অগ্নিবায়ু বা ধ্বসে যাওয়া অথবা ছূরত বিকৃত হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাক।

(তিরমিযী-৪/২৩৬, হাদীস নং-২২১০)

দেখুন রাসূল ﷺ সলফদের ভাল-মন্দ বলা সম্বন্ধে কিরূপ ভীতি প্রদর্শন করেছেন। আর সেই কাজটি নামধারী আহলে হাদীসের জন্য গৌরবের বিষয়।

৫. তাবলীগ জামাতের প্রতি কটূক্তি করে যে, তারা শিরকজনিত আক্বীদার জালে আবদ্ধ একটি ফিরকা। (দেখুনঃ জামাত তাবলীগ-পৃ৭, তারা কবর পূঁজা করে পৃ ২৯৮, তারা শিয়া ও কাদিয়ানিদের মত-৬১)

অথচ এ তাবলীগ-জামাত মানুষদেরকে তাহওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন। শত শত কাফির-মুশরিক তাদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করছে। বিশ্বের সর্বশ্রেণীর হক্কানী আলেমগণ এই জামাতের সাথে জড়িত আছেন। যা

সবার সামনে স্পষ্ট। তার পরেও তাঁদের ব্যাপারে এ ধরণের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ দেওয়া, এটি আহলে হাদীসদের গুমরাহ হওয়ার পরিচয় বহন করে।

৬. তারা বলে যে, কেউ তাক্বলীদ করে হানাফী হয়ে মারা গেলে সে মুশরিক হয়ে মারা গেল। তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করাও বৈধ হবে না (**نعوذ بالله**) (দেখুন- সীরাতে মুহাম্মদী পৃ-৪৭)

অথচ হাজার বৎসরের ইতিহাস যে, এই হানাফীগণই হিন্দুস্থানের মধ্যে মানুষদেরকে তাওহীদের বার্তা। তাঁরা তাওহীদের দিয়েছেন মেহনত না করলে সেই লা-মায্হাবীরাও মুসলমান হতে পারত না। মুসলমানদের ঘরে জন্ম নিতে পারত না। অথচ কোন মুসলমানকে কাফির-মুশরিক আখ্যা দেওয়া কবীরা গুনাহ। আর যাদের মেহনতের বদৌলতে সে নামধারী আহলে হাদীস মুসলমান হতে পেরেছে, তাঁদেরকে মুশরিক বলা কত বড় জঘন্যতম অপরাধ। আর যারা এ ধরণের অপবাদ দেয়, তারা ফিৎনাকারী হওয়ার জন্য আর কি বাকি রয়েছে?

৭. তারা দ্বীনের ছোট ছোট বিষয় তথা সুন্নাত-মুস্তাহাব, উত্তম-অনুত্তমের মাসআলা নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করে। ঈদের মাঠে ছয় আর বার তাকবীরের মাসআলা নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি করার ঘটনা অনেক সংঘটিত হয়েছে। জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার মাসআলা নিয়ে মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে ঝগড়া-ফাসাদ করার ঘটনাও অনেক ঘটেছে। এ ধরণের ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তারা ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত। আর হাদীসের ভাষায় এ ধরণের লোক আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচাইতে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত ব্যক্তি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদ করেন-

ابغض الرجال الى الله الالد الخصم

অর্থ: আল্লাহ তাআ'লার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হলো, যে তীব্র ঝগড়াটে ও অধিক কলহবাজ। (বুখারী- ৩/১৩৬৭, হাদিস নং-৪৫২৩)

উল্লিখিত সাতটি মারাত্মক ব্যাধি নামধারী আহলে হাদীসের সামে পরিপূর্ণ বিদ্যমান। যার একটাই কেউ ফিৎনাবাজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এরপরও তারা গুমরাহ এবং ফিৎনাবাজ দল হিসাবে গণ্য হওয়ার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে কি?

না, কোন সন্দেহ নেই যে, তারা উম্মতের জন্য অনেক বড় ফিৎনা। কিন্তু সরলমনা মুসলমানগণ তাদের "আহলে হাদীস" নাম দেখে, তাদের

প্রতারণাজনিত আকার-আকৃতি দেখে, তাদের মুখে হাদীসের বাণী শুনে ধোঁকা খাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে সেই ফিৎনাবাজ আহলে হাদীসদের ধোঁকার জাল থেকে মুসলমানদেরকে বাঁচানো ও তাদের ফিৎনা সম্বন্ধে মানুষদেরকে সচেতন করা, আলেম সমাজের নৈতিক দায়িত্ব।

এক্ষেত্রে ভাই রুহুল্লাহ বিন মোস্তফা নোমানী কর্তৃক অনূদিত ও সংকলিত "আহলে হাদীসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ" বইটি সত্যিই প্রশংসনীয়। আশা করি উক্ত পুস্তিকার মাধ্যমে মানুষ সেই ফিৎনার ব্যাপারে সচেতন হবে এবং তারা যে সমস্ত মাসআলা নিয়ে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, সে সম্বন্ধে বাস্তব কথাটা বুঝতে সক্ষম হবে। প্রকাশকের পক্ষ থেকে আমাকে একটা অভিমত লেখার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু অধম অযোগ্যতার কারণে অভিমত লিখার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করি। বলি যে, আমি অধম এ বিষয়ের যোগ্য নই। তবে আমিও এ মোবারক কাজে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে দু'কলম লিখার চেষ্টা করবো। তাই দু'কলম লিখা হয়েছে।

পরিশেষে দু'আ করি, আল্লাহ পাক এ প্রয়াসকে কবুল করুন এবং এর উদ্দেশ্যের মধ্যে কামিয়াব করুন। লেখক, প্রকাশক ও সহযোগী সবাইকে আল্লাহ পাক কবুল করুন এবং আরো বেশি দ্বীনের খিদমত করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন।

বিনীত

(মুহাম্মদ কুতুবুদ্দীন নানুপুরী)
শিক্ষক: জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া
নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

১২ মাসআলাঃ ২০ চ্যালেঞ্জ ও ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার

মূলঃ
আল্লামা মুনীর আহমদ মুলতানী

অনুবাদঃ
রুহুল্লাহ নোমানী

লিখক ও কিতাব সম্পর্কে

بارہ مسائل بیس لاکھ انعام আল্লামা মুনীর আহমদ মুলতানী রচিত একটি অনবদ্য কিতাব। আহলে হাদীসের 'মাযহাব মানিনা, তাকলীদ করিনা', দাবীর অসারতা বুঝার জন্য এ ছোট্ট কিতাবটি যথেষ্ট। মাত্র ১২টি মাসআলার তাহকীক করে লিখক দেখিয়েছেন- মাযহাব পন্থীরা কী পরিমাণ হাদীস অনুসারী এবং আহলে হাদীস কী পরিমাণ তাকলীদে অভ্যস্ত বরং তাকলীদ করতে বাধ্য। এ কিতাবটি অধ্যয়ন করলে যে কোন ন্যায় পরায়ণ আহলে হাদীসের ভুল ভাঙ্গবে। ইনশা আল্লাহ। সাথে সাথে মুকাল্লিদগণ ধূর্ত আহলে হাদীসের মোকাবালার সহজ হাতিয়ার পেয়ে যাবেন। লাখ লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ জানাতে অভ্যস্ত আহলে হাদীসকে লিখক ২০টি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। সাথে দিয়েছেন ২০ লক্ষ টাকা অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ।

কিতাবটি ভাষান্তর করার জন্য আব্দুর রহমান ভাই (গাইবান্ধা) অনুরোধ করেছিলেন। ভাবলাম- বিতর্কিত বেশ কয়েকটি মাসআলার নিরপেক্ষ সমাধান কিতাবটির মধ্যে রয়েছে। ভাষান্তর হয়ে সবার হাতে পৌঁছলে ফায়দা হবে নিশ্চয়ই। সাথে সাথে লিখকের খিদমতের পরিসরও ব্যাপকতা লাভ করবে। তাই লিখকের পুখপাত্র হয়ে তাঁর পয়গাম সকলের নিকট পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হলাম। কবুল করার মালিক আল্লাহ।

কিতাবটি অধ্যয়ন করলে মাযহাবের প্রতি লিখকের অনুরাগ এবং তার ইলমী গভীরতা অনুমান করা যায়। অধ্যয়ন কালে পাঠক লিখকের অন্তরের উত্তাপ অনুভব করবেন। তিনি আহলে হাদীসের পদ্ধতি এড়িয়ে শালীন ও সাবলীল ভাষায় হানাফী মাযহাবের উদ্দিষ্ট মাসআলাসমূহ প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। লিখক কিতাবে মুসাফাহাসহ আহলে হাদীসের সাথে বিতর্কিত নামাযের সকল মাসআলার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। নিরপেক্ষ সমাধান প্রদান করেছেন। সাথে সাথে কথায়-কথায় চ্যালেঞ্জ জানাতে অভ্যস্ত আহলে হাদীসের উদ্দেশ্যে- প্রতি মাসআলায় এক বা একাধিক চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। আহলে হাদীস শুধু হাদীস অনুসরণ করে এসব চ্যালেঞ্জের উত্তর দিলে তো তাদের মুখ বাঁচবে। কিন্তু ব্যর্থ হলে তারা কিভাবে যে মুখ দেখাবেন আল্লাহই ভাল জানেন। লজ্জা তো মানুষের স্বভাব জাত প্রবৃত্তি। আল্লাহ সকলকে সুমতি দান করুক। আমীন।

আব্দুর রহমান ভাইয়ের অনুমতি সাপেক্ষে মিযান ভাই ছাপানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে দ্বীনি খিদমতের জন্য কবুল করুন। আমীন

বিনীত
রুহুল্লাহ নোমানী

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

প্রারম্ভিকা

আলোচনা দ্বীনি ব্যাপারে হোক কিংবা দুনিয়াবী ব্যাপারে, নিয়ম মেনে হলে তা কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ হয়। আর নিয়মবর্জিত আলোচনা শুধু সময় নষ্ট করা। এ জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও আহলে হাদীসের মাঝে বিবাদমান কোন মাসআলা নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে উভয় পক্ষের মাঝে স্বীকৃত কতিপয় উসূল ও মূলনীতি নির্ধারণ করে নেয়া সঙ্গত মনে করি। যাতে আহলে সুন্নত ও আহলে হাদীসের মাঝে বিতর্কিত কোন বিষয়ে মৌখিক বা লিখিত আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হয়।

আহলে হাদীসের তিনটি মূলনীতি

প্রথম মূলনীতি: শরীয়তের দলীল শুধু দু'টি

আহলে হাদীস শুধুমাত্র দু'টি দলীলই মান্য করেন। কোরআন ও হাদীস। এতদুভয় ব্যতীত তাদের নিকট তৃতীয় কোন দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের দাবী ও শ্লোগান হল-

আহলে হাদীসের দুই উসূল
কোরআন ও হাদীসে রাসূল ﷺ।

আহলে হাদীসের নেতা মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী বলেন- ভাইয়েরা! আপনার হাত দু'টি। আর শরীয়ত আপনাকে দু'হাতে দু'টি বস্তু দিয়েছে। আল্লাহর বাণী ও রাসূলের বাণী। এরপর আপনার যেমন তৃতীয় হাতও নেই, (শরীয়তের পক্ষ থেকে আপনার জন্য) তৃতীয় কোন বস্তুও নেই। (লাহোর থেকে প্রকাশিত ত্বরীকে মুহাম্মাদী পৃষ্ঠা নং ১৯)

দ্বিতীয় মূলনীতি: কারো কিয়াসই দলীল নয়

আহলে হাদীসের নিকট নবী কিংবা উম্মত, কারো কেয়াসই দলীল নয়। তাদের নেতা মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী বলেন- শুনেন! বুযর্গদের, মুজতাহিদদের, ইমামদের কেয়াসতো দূরের কথা, শরীয়তে ইসলামে রাসূল ﷺ এর কোন কথা সরাসরি ওহি না হলে, তাও হুজ্জত নয়।

লাহোর থেকে প্রকাশিত 'ত্বরীকে মুহাম্মদী পৃ: নং- ৫৭.

আহলে হাদীস আলেম মুহাম্মদ আবুল হাসান সাহেব বলেন- কেয়াস করোনা। কেননা সর্ব প্রথম কেয়াস করেছে শয়তান। (যফরুল মুবীন পৃ: ১৪)

তৃতীয় মূলনীতি: তাকলীদ করা শিরক

আহলে হাদীসের নিকট উম্মতের তাকলীদ হল শিরক। তাদের বড় আলেম মাওলানা আবুল হাসান সাহেব বলেন- এবং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ইমাম চতুষ্টয় কিংবা অন্য যার তাকলীদই হোকনা কেন তা হল শিরক। (যফরুল মুবীন- পৃ: ২০)

সংকীর্ণতার একটি দৃষ্টান্ত:

এ সর্ম্পকে প্রশ্ন-উত্তর আকারে উপস্থাপিত আহলে হাদীসের নেতা মাওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর একটি মাসআলা লক্ষ করুন

(**প্রশ্ন**- ৪০: এটা কি ঠিক যে, কোন ওহাবীর (আহলে হাদীস) পিতা হানাফী হয়ে মৃত্যু বরণ করলে, সে ربي اغفرلي و لوالدي (হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা কর) এ দু'আ পড়বে না?

উত্তর: মুশরিকদের জন্য দু'আয়ে মাগফেরাত করা জায়েয নেই।

(লাহোর থেকে প্রকাশিত- সিরাতে মুহাম্মদী-পৃ: ৪৭)

এ কিতাবেরই **১২**নং পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে- তাকলীদ হল শিরক।

তাকলীদের ভুল সংজ্ঞা-

আহলে হাদীসের একজন প্রাজ্ঞ আলেম তাকলীদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন- তাকলীদ হল দলীল ছাড়া কোন বিধান মেনে নেয়া এবং এ কথা জিজ্ঞাসা না করা যে, এ বিধান আল্লাহ ও রাসূল সমর্থিত কিনা?

(যফরুল মুবীন পৃ: ১৫)

এগুলো আহলে হাদীসের মূলনীতি হওয়ার দলীল:

আহলে হাদীস উল্লেখিত তিনটি মূলনীতির প্রকাশ্য ঘোষণা করে থাকেন। সুতরাং তাদের কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিলনা। তবুও কথা শক্তিশালী করার জন্য তাদের নিভর্রযোগ্য কয়েকটি কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করা হল। **২৯** শে মার্চ **১৯৩৭** ইং

সালে “অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কন্‌ফারেন্স” অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মাওলানা আবু ইয়াহইয়া ইমাম খান নোশহারাবী ‘আহলে হাদীসের ইলমী খেদমত’ এর উপর একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ পেশ করেন। যা প্রথমে হিন্দুস্থান ও দেশ ভাগের পরে পাকিস্তান থেকে هندوستان میں اهل حديث كي علمي خدمات নামে প্রকাশ করা হয়। এ প্রবন্ধে যে সমস্ত কিতাবের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল তাদের নির্ভরযোগ্য কিতাব। এ সমস্ত কিতাবে আহলে হাদীসের মাসআলা ও আকীদা বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো তাদের নির্ভরযোগ্য কিতাব না হলে তারা এ সমস্ত কিতাবকে ইলমী খেদমত হিসাবে পেশ করত না। উল্লিখিত তিন কিতাবের মধ্যে الظفر المبين এর নাম এ তালিকার ৬০ নং পৃষ্ঠায়, طريق محمدي এর নাম ৭২নং পৃষ্ঠায় এবং سراج محمدي এর নাম ৬৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

আহলে হাদীসের জন্য অবশ্য পালনীয় মূলনীতি:

যেহেতু গায়রে মুকাল্লিদীনের নিকট উম্মতের তাকলীদ হল শিরক। আর কেয়াস হল, শয়তানের কাজ। সুতরাং এ উসূল অনুযায়ী তারা কোন রাবী সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য, হাদীসের মান তথা হাদীসটি সহীহ কিংবা যয়ীফ ইত্যাদি বয়ান করার জন্য, এমনকি কোন হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার জন্য উম্মতের কারো মত ও মন্তব্য পেশ করতে পারবেন না।

তারা শুধু কোরআনের আয়াত ও হাদীসের অনুবাদ করবেন। ব্যাখ্যা করার ছুতোয় আপন খেয়াল অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন না। আহলে হাদীস বন্ধুরা হাদীসের তরজমা করার পর আপন মতলব পূরণের জন্য যে ব্যাখ্যা পেশ করেন তা তো তাদেরই কথা। কিন্তু আপন মতকেই তারা হাদীস নামে অভিহিত করেন।

উদাহরণস্বরূপ:- لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب

যে ব্যাক্তি সূরায়ে ফাতিহা পড়ল না, তার নামায হয়নি।

(বুখারী শরীফ পৃ: ১০৪ খ: ১)

এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম আহমদ এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ: বলেন-এখানে একাকী নামায আদায় কারীর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ একাকী নামায আদায়কারী সূরায়ে ফাতিহা না পড়লে তার নামায হবে না। কিন্তু আহলে হাদীস বলে- এখানে “من” শব্দটি ব্যাপক। ইমাম, মুক্তাদী, মুনফারিদ তথা একাকী নামায আদায়কারী সবাই এর অর্ন্তভুক্ত। বুঝলাম। কিন্তু হাদীসে “من” শব্দটি যে ব্যাপক, এতো তাদের কথা একথা আল্লাহও বলেননি, রাসূলও বলেন নি। অথচ তারা এ হাদীস পেশ করে বলবে- রাসূল সা. বলেছেন - সূরা ফাতিহা ব্যতীত ইমাম, মুক্তাদী, মুনফারিদ; কারো নামাযই হবে না। অর্থাৎ আপন মতকেই তারা হাদীস নামে চালিয়ে দিবে। এজন্য আলোচনাকালে তারা উম্মতের কারো কথা বা মত পেশ করলে সর্ব প্রথম তাদেরকে তাকলীদের শিরক ও কিয়াসের শয়তানী থেকে তওবা করাবেন। এরপর সামনে অগ্রসর হবেন।

আহলে সুন্নাতের তিনটি মূলনীতি:

প্রথম মূলনীতি: শরীয়তের দলীল চারটি

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত- চাই হানাফী হোক বা শাফেয়ী,মালেকী কিংবা হাম্বলী সকলের নিকটেই শরয়ী আহকাম চার দলীলের কোন একটির দ্বারা প্রমাণিত হয়। কোরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস। অর্থাৎ শরীয়তের মাসআলা কোনটা কোরআন দ্বারা, কোনটা হাদীস দ্বারা, কোনটা ইজমা দ্বারা, কোনটা কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হয়। (আবার কোন কোন মাসআলা একত্রে চারোটা দ্বারা কিংবা একাধিক দলীল দ্বারাও প্রমাণিত হয়।)

কিয়াস বলতে কী বুঝায়?

কিয়াস থেকে উদ্দেশ্য হল কোরআন, হাদীস বা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হুকুমের মাঝে লুকায়িত কায়েদায়ে কুল্লিয়া বা সূত্র তালাশ করে কোরআন-হাদীসে সরাসরি বর্ণিত নয় এমন মাসআলার সমাধান বের করা।

উদাহরণ:

হাদীস শরীফে এসেছে খাবারে মাছি পড়লে ডুবিয়ে দাও, এরপর মাছি বের করে ফেলে দাও এবং খানা খেয়ে নাও। এখন প্রশ্ন হল খাবারে বিচ্ছু, বল্লা, টিডিড, মশা, জোনাকি ইত্যাদি পড়লে হুকুম কী হবে?

এ প্রশ্নের জবাব কোরআন, হাদীস, ইজমায় সরাসরি বর্ণিত নেই। এজন্য ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. কিয়াস করে এ প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন। তিনি গবেষণা করে দেখলেন- মাছি পড়া সত্ত্বেও খাবার পবিত্র থাকার কী কারণ থাকতে পারে যে, রাসূল সা. খাওয়ার অনুমতি দিলেন? শেষতক প্রতীয়মান হল যে, মাছির শরীরে প্রবহমান রক্ত নেই। এখান থেকে তিনি একটি সূত্র গ্রহণ করলেন। তা হল- যে প্রাণীর শরীরে প্রবহমান রক্ত নেই, তার বিধানও মাছির বিধানের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ তা পতিত হলে খানা অপবিত্র হবে না। বরং ওটা বের করে খানা খাওয়া যাবে।

তবে ডুবিয়ে দেয়ার হুকুম শুধু মাছির জন্য প্রযোজ্য। কেননা মাছির এক ডানায় জীবানু থাকে, আর অপর ডানায় থাকে জীবাণু ধ্বংসকারী। তার অভ্যাস হল- জীবাণুবাহী ডানা ডুবিয়ে দিয়ে, অপর ডানা উঠিয়ে রাখা। কিন্তু এ বিষয়টি বল্লা, জোনাকি ইত্যাদির মাঝে নেই বিধায় এ বিধান ও গুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

সুতারাং বুঝা গেল শরয়ী কিয়াস মানে শুধু বিবেকপ্রসূত যুক্তি নয়। অথচ আহলে হাদীস মুজতাহিদ ও ফুকাহায়ে কেরামের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টির মানসে এ মিথ্যা প্রলাপটিই সদা উপস্থাপন করে চলছে। এর কারণ বুঝের দুর্বলতা কিংবা বক্রতা যাই হোকনা কেন পরিণতিতে স্বজাতি চরম বিভ্রান্তি ও অনাকাঙ্খিত বিভক্তির শিকার হচ্ছে। যা কোন সাদা দিলের আহলে হাদীসেরও কাম্য হতে পারেনা।

দ্বিতীয় মূলনীতি: হাদীস শাস্ত্রে হাদীস বিশারদের কথাই গ্রহণযোগ্য

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত; বরং দুনিয়ার সকল বিবেকবান মানুষের নিকটই- প্রত্যেক শাস্ত্রে শাস্ত্রবিশেষজ্ঞের মতই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেমন চিকিৎসা বিষয়ক সমস্যা হলে চিকিৎসকের, ইঞ্জিনিয়ারী বিষয়ক সমস্যা হলে ইঞ্জিনিয়ারের, কৃষি বিষয়ক সমস্যা হলে কৃষিবিদের,

বৈকরণিক সমস্যা হলে ব্যাকরণবিদের, ভাষা বিষয়ক সমস্যা হলে ভাষাবিদের মত গ্রহণযোগ্য হবে। অনুরূপ হাদীস সহীহ কিংবা যয়ীফ হওয়ার ক্ষেত্রে হাদীস বিষেশজ্ঞদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

হাদীসের প্রকরণ:

এ বিষয়টি অতীব প্রণিধান যোগ্য যে, হাদীস সহীহ কিংবা যয়ীফ হওয়ার প্রকরণ দু' দিক থেকে হয়ে থাকে। যথা-

(১) সনদের দিক থেকে।

(২) আমলের দিক থেকে।

দ্বিতীয় প্রকরণের ব্যাখ্যা হল- কোন হাদীস অনুযায়ী আমল করা হলে তা সহীহ। আর যে হাদীস অনুযায়ী আমল করা হয় না তা যয়ীফ।

এ কারণেই ইমামে আযম আবু হানিফা রহ: ইমাম আওযায়ী রহ: এর সাথে মুনাযারা (বির্তক) কালে রুকুতে যাওয়ার সময় হাত উত্তোলন সর্ম্পকীয় ইবনে ওমর রাযি. এর হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছিলেন।

(আল মুদাও ওয়ানাতুল কুবরা- খ. ১, পৃ. ৭১)

অন্যথায় ইবনে ওমর রাযি. এর হাদীস সনদের দিক থেকে সম্পূর্ণ সহীহ। বরং এ হাদীসের সনদ সর্বাধিক সহীহ সনদসমূহের মাঝে অন্যতম।

এ আলোচনার নিরিখে সহীহ হাদীসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) সনদের দিক থেকে সহীহ হাদীস।

(২) আমল বা প্রয়োগের দিক থেকে সহীহ হাদীস।

অনুরূপ হাদীস বিশারাদগণও দু'ভাগে বিভক্ত। যথা:-(১) মুহাদ্দিসীন (২) মুজতাহিদীন।

মুহাদ্দিসীনের গবেষণা:

মুহাদ্দিসীন হাদীসের সনদ ও শব্দ নিয়ে গবেষণা করেন। তারা রাবীদের জীবনচরিত নিরীক্ষণ করে সনদের মান নির্ধারণ করেন। নির্ণয় করেন- কোন সনদটি মওযূ, কোনটি গায়রে মওযূ। কোনটি সহীহ, কোনটি গায়রে সহীহ। আবার সহীহ না হয়ে কোনটি হাসান, কোনটি যয়ীফ। এবং এও নির্ণয় করেন যে, সনদটি কোন স্তরের সহীহ কিংবা কোন স্ত রের যয়ীফ ইত্যাদি। কখনো কখনো তারা একাধিক সনদে বর্ণিত হাদীসের কোন রাবীর থেকে কী শব্দ পার্থক্য পাওয়া গেল তাও চিহ্নিত করেন।

মুজতাহিদগণের বিশ্লেষণ পরিধি:

আর মুজতাহিদীনের বিশ্লেষণ পরিধি আরো বিস্তৃত। তারা পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। যথা-

১. সনদের দিক থেকে হাদীসটি প্রমাণিত না প্রমাণিত নয়।
২. হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা।
৩. আমলের দিক থেকে হাদীসটি সহীহ না গায়রে সহীহ। অর্থাৎ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করা হয়; না। হয় না।
৪. হাদীসলব্ধ বিধানটি কোন ধরণের? ফরজ না ওয়াজিব, সুন্নত না মুস্তাহাব, মুবাহ না মাকরূহ, মাকরূহে তানযিহী না তাহরিমী অথবা হারাম না হালাল ইত্যাদি।
৫. এ হাদীসের সাথে অন্য হাদীসের বিরোধের কী সামধান?

এ পাঁচ বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুজতাহিদের নিজস্ব উসূল ও মূলনীতি রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. সনদের সাথে আছারে সাহাবা (সাহাবাদের আমল ও উক্তি) কেও যোগ করেন। হ্যাঁ সাহাবাগণের আমল ও উক্তি পাওয়া না গেলে কোরআন-সুন্নাহ থেকে উদ্ভাবিত মূলনীতি এবং আল্লাহ প্রদত্ত ফাকাহাত ও বুৎপত্তির আলোকে সমাধান বের করেন।

পরবর্তীতে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ছাত্রবৃন্দ এবং অন্যান্য হানাফী ফোকাহায়ে কেরাম তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনের আমল ও উক্তিকেও যোগ করেছেন।

ফিকহর সংজ্ঞা :

ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং তার ছাত্রবৃন্দ ইমাম আবু ইউসুফ,ইমাম মুহাম্মদ সহ অন্যান্য ইমামগণের তাহকীক ও বিশ্লেষণের আলোকে শরয়ী আহকাম সংশ্লিষ্ট হাদীস ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সকল ফিকহী মাসআলাকে ত্বহারাত পর্ব থেকে মিরাছ পর্ব পর্যন্ত সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। শরয়ী আহকামের এ সামষ্টিকরূপকে ফিকহ বলা হয়।

আমাদের দৃষ্টিতে সহীহ হাদীস:

হাদীস সহীহ কিংবা যয়ীফ হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মূলনীতি হল- ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তার সুযোগ্য ছাত্রবৃন্দ, আছারে (উক্তি ও আমল)

সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন থেকে গৃহীত উসূলের আলোকে মাসআলা উদ্ভাবন করে যে সব হাদীস অনুযায়ী আমল করার ফায়সালা করেছেন, সেগুলো আমাদের নিকট সহীহ। যদিও মুহাদ্দিসীন সনদের দিক থেকে উক্ত হাদীসকে যয়ীফ বলুন না কেন।

আর ফোকাহায়ে কেরাম যে সব হাদীস অনুযায়ী মাসআলা উদ্ভাবন করেননি সেগুলো আমাদের নিকট যয়ীফ। যদিও মুহাদ্দেসীন সনদের বিচারে সেগুলোকে সহীহ বলুন না কেন।

সনদ তাহকীকের ফায়দা:

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে কারো প্রশ্ন হতে পারে- তাহলে মুহাদ্দিসীনে কেরামের সনদ তাহকীকের ফায়দা কী?

জবাব:

এ প্রশ্নের উত্তর হল- যাতে মিথ্যুক বদদীন মিথ্যা হাদীস রচনার হিম্মত করতে না পারে। তাহকীকে সনদ এ পথে অনেক বড় প্রতিবন্ধক।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন- যদি সনদ নিরীক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা না হত,মানুষ যা ইচ্ছা বলে ফেলত। (মুসলিম পৃ: ১২)

সহীহ-যয়ীফ নির্ণয়ে মুজতাহিদগণের পদ্ধতি পাঁচ কারণে অগ্রগণ্য:

উপরে সহীহ যয়ীফ নির্ণয়ের দু'টি পন্থা আলোচনা হল। মুহাদ্দিসীনের পদ্ধতি ও মুজতাহিদীনের পদ্ধতি। এখন প্রশ্ন হল এ দু পন্থার মাঝে অগ্রগণ্য পদ্ধতি কোনটি ?

এর উত্তর হল- ফোকাহায়ে কেরামের পন্থা এবং তা কয়েটি কারণে। যথা-

প্রথম কারণ:

যে কোন বিষয়েই সংশ্লিষ্টদের কথা বেশী গুরুত্ব বহন করে। মুহাদ্দিসীনের বিষয় হল সনদ বিশ্লেষণ। আর মুজতাহিদীনের বিষয় হল আমল বিশ্লেষণ। তারা নির্ণয় করেন এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে একাধিক হাদীসের মধ্যে কোন হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে। ফল কথা হল- সনদের দিক থেকে এ হাদীস সহীহ না যয়ীফ? এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনের কথা শিরোধার্য। আর আমলের দিক থেকে এ হাদীস সহীহ না যয়ীফ এ ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের কথা অগ্রগণ্য।

দ্বিতীয় কারণ-

মুহাদ্দিসীনে কেরাম সনদ নিরীক্ষণে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এরপরও আমলের ক্ষেত্রে তাঁরা ফুকাহায়ে কেরামের অনুসরণ করতেন। আহলে হাদীস আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সাহেবের তাহকীক মতে সকল মুহাদ্দিসই ইমাম চতুষ্টয়ের কারো না কারো মুকাল্লিদ ছিলেন। নিম্নে তার الحطة في ذكر الصحاح الستة নামক গ্রন্থ থেকে পৃষ্ঠা নং সহ মুহাদ্দিসীনের ফিকহী মাযহাব তুলে ধরা হলো।

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের দৃষ্টিতে মুহাদ্দিসীনের ফিকহী মাযহাব

ক্র.নং	মুহাদ্দিস	মাযহাব	পৃ.নং
০১	ইমাম বুখারী রহ.	শাফেয়ী	২৮১
০২	ইমাম মুসলিম রহ.	শাফেয়ী	২২৮
০৩	ইমাম নাসায়ী রহ.	শাফেয়ী	২৯৩
০৪	ইমাম আবু দাউদ রহ.	হাম্বলী/শাফেয়ী	২৮৮
০৫	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ.	হাম্বলী	১৬৭
০৬	মিশকাত প্রণেতা রহ.	শাফেয়ী	১৩৫
০৭	ইমাম খাত্তাবী রহ.	শাফেয়ী	১৩৫
০৮	ইমাম নববী রহ.	শাফেয়ী	১৩৫
০৯	ইমাম বাগভী রহ.	শাফেয়ী	১৩৫
১০	ইমাম ত্বহাবী রহ.	হানাফী	১৩৫
১১	শায়খ জিলানী রহ.	হাম্বলী	৩০০
১২	ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.	হাম্বলী	১৬৮
১৩	ইমাম ইবনে কায়্যিম রহ.	হাম্বলী	১৬৮
১৪	ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ.	মালেকী	১৩৫
১৫	ইমাম শায়খ আব্দুল হক রহ.	হানাফী	১৬০
১৬	শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর খান্দান	হানাফী	১৬০-১৬৩
১৭	ইমাম ইবনে বাত্তাল রহ.	মালেকী	২১৩
১৮	ইমাম হালাবী রহ.	হানাফী	২১৩
১৯	শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবুদ দায়েম রহ.	শাফেয়ী	২১৫
২০	ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহ.	হানাফী	২১৬
২১	ইমাম যারকাশী রহ.	শাফেয়ী	২১৭
২২	ইমাম কাজী মুহিব্বুদ্দীন আহমদ রহ.	হাম্বলী	২১৮
২৩	ইমাম ইবনে রজব রহ.	হাম্বলী	২১৯
২৪	ইমাম বুলকিনী রহ.	শাফেয়ী	২১৯
২৫	ইমাম ইবনে মারযুকী রহ.	মালেকী	২২০
২৬	ইমাম জালালুদ্দীন বকরী রহ.	শাফেয়ী	২২০
২৭	ইমাম কুস্তলানী রহ.	শাফেয়ী	২২২
২৮	ইমাম ইবনে আরাবী রহ.	মালেকী	২২৪

তৃতীয় কারণ-

কোন হাদীস সর্ম্পকে সহীহ কিংবা যয়ীক বলে মুহাদ্দিসীনে কেরাম যে ফয়সালা করেন, এটা একটা ইজতিহাদী বিষয়। এর ভিত্তি হল রাবীগণের জীবনচরিত।

মুজতাহিদীনে কেরামের আমলের ভিত্তিতে সহীহ- যয়ীফ নির্ণয়ও ইজতিহাদী। কিন্তু এ নির্ণয়ের ভিত্তি হল সাহাবা ও তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনের আমল ও উক্তি। এখান থেকেই বুঝা যায় কাদের ফায়সালা বেশী শক্তিশালী।

চতুর্থ কারণ-

স্বয়ং মুহাদ্দিসীনে কেরামও বলেন- যে হাদীসকে তারা সহীহ বলেন আবশ্যক নয় যে বাস্তবেও সেটা সহীহ হবে। আবার যে হাদীসকে তারা যয়ীফ বলেন, আবশ্যক নয় যে বাস্তবেও সেটা যয়ীফ হবে। কেননা অনেক সময় কোন মুহাদ্দিস কর্তৃক যয়ীফ আখ্যায়িত হাদীসও বাস্তবে সহীহ হয়ে থাকে। (মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ পৃ: ৮)

পঞ্চম কারণ-

ইমাম আবু হানিফা রহ. যে সকল হাদীসের আলোকে মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন, তা তার পর্যন্ত সনদের প্রতি লক্ষ করে। এখন পরবর্তীতে

কোন হাদীসের সনদ দূর্বল হলে, তা ইমাম আবু হানিফার উদ্ভাবিত মাসআলার উপর কিভাবে প্রভাব ফেলবে? আর আমরা ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক হাদীসের আলোকে উদ্ভাবিত ফিকহর উপর নির্ভর করে থাকি। সুতরাং দু' একটি মাসআলার ক্ষেত্রে সনদের দিক থেকে পরবর্তী দূর্বলতা কোন বড় ব্যাপার নয়। এজন্য আমরা এসবের জওয়াব দেয়ারও প্রয়োজন মনে করি না।

তৃতীয় মূলনীতি: ইজতিহাদী মাসআলার তাকলীদ করা ওয়াজিব

মুজতাদি না হলে, তিনি এমন একজন মুজতাহিদের তাকলীদ করবেন, যিনি তার দৃষ্টিতে সকল মুজতাহিদের মাঝে বেশী যোগ্য ও পারদর্শী এবং তার দৃষ্টিতে যার ইজতিহাদ বেশী সঠিক ও শক্তিশালী। ইজতিহাদী মাসআলায় গায়রে মুজতাহিদের উপর এ তাকলীদ ওয়াজিব। চাই এ ইজতিহাদ হাদীসের মান নির্ণয় বিষয়ে হোক কিংবা নামায-রোযা অথবা হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত। কোন ক্রমেই গায়রে মুজতাহিদের জন্য মুজতাহিদের বক্তব্য-বিশ্লেষণের উপর অভিযোগ করার অধিকার থাকবেনা এবং মুজতাহিদের বিপরীতে তার অজ্ঞতাপ্রসূত ইজতিহাদের অনুমতিও থাকবেনা। যোগ্যতা ব্যতীত ইজতিহাদের দাবী, আপন পাগলামী ঘোষণা করার নামান্তর।

ইজতিহাদী মাসআলার প্রকারভেদ :

ইজতিহাদী মাসআলা তিন প্রকার। যথা-

১. এমন মাসআলা যা কোরআন-হাদীসে সরাসরি বর্ণিত নেই। যেমন মশা, বল্লা, বিচ্ছু ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যে পতিত হলে, বিধান কী হবে? রক্ত পুশ করা, অঙ্গ সংযোজন করা, টেলিফোনে বিবাহ, রোযা রেখে ইনজেকশন নেয়া ইত্যাদির হুকুম কী হবে?
২. এমন মাসআলা কোরআন কিংবা হাদীসে যার দলীল উল্লেখ থাকলেও তা বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। যেমন: রুকুতে গমনকালে হাত উত্তোলন,ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়া ইত্যাদি। এসবের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বোধক ও না বোধক উভয় প্রকারের হাদীস বিদ্যামান রয়েছে।
৩. এমন মাসআলা যার দলীল শব্দগত দিক থেকে এক হলেও পরস্পর বিরোধী অর্থের সম্ভাবনা রাখে। যেমন তালাক প্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত সম্পর্কে কোরআনে এসেছে, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء অত্র আয়াতের قروء শব্দটি قرء এর বহুবচন। যা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে হায়েয ও তুহুর (হায়েয পরবর্তী পবিত্র অবস্থা), উভয় অর্থের সমান সম্ভাবনা রাখে। ইমাম শাফেয়ী রহ. দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন। তার নিকট তালাকপ্রাপ্তা তিন তুহুর ইদ্দত পালন করবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা প্রথম অর্থ গ্রহণ করে বলেন- তালাক প্রাপ্তা তিন হায়েয ইদ্দত পালন করবে।

এ তিন প্রকার ইজতিহাদী মাসআলার যে প্রকারই হোকনা কেন, আমল করার ক্ষেত্রে তাকলীদ ব্যতীত গায়রে মুজতাহিদের দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। তাকলীদ ব্যতীত দ্বিতীয় পথ অবলম্বনের জন্য শরীয়তও অনুমোদন করেনা এবং বিবেকও অনুমতি দেয়না। (কেননা, এসব ক্ষেত্রে সমাধান বের করা শুধু মুজতাহিদের পক্ষেই সম্ভব। আর মুকাল্লিদ তো মুজাতাহিদ নন।)

আহলে হাদীসের সাথে মুনাযারার আটটি মূলনীতি:

আহলে হাদীসের সাথে বির্তকের সময় বেশ সর্তক থাকতে হয়। কিছু মূলনীতির অনুসরণ করতে হয়। অন্যথা কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয় না।

প্রথম মূলনীতি: অমার্জিত ব্যবহারের উপর ধৈর্য ধারণ করা

আহলে হাদীস ইমাম আবু হানিফা এবং অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরামের শানে অশোভন, অসত্য ও অমার্জিত শব্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত। তারা এমন শ্রুতিকটু শব্দ ব্যবহার করে যে, অনেক সময় বরদাশত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবুও যে কোন মূল্যে সংবরণ করতে হবে। অন্যথায় আহলে হাদীস এ প্রপাগান্ডা করবে যে, আমরা তো মাসআলা বুঝতে চাই। আর তারা মাসআলা না বুঝিয়ে অযথা রাগ করে। শুধু শুধু লড়তে উদ্যত হয়। এজন্য আহলে সুন্নতের উচিৎ বির্তকের শুরু থেকে শেষ আপন ভাবগাম্ভীর্য ও ধৈর্য্য অটুট রাখা। যাতে আহলে হাদীস অসত্য অপবাদ আরোপের কোন সুযোগ না পায়।

দ্বিতীয় মূলনীতি: আলোচনার মূলনীতি নির্ধারণ করে নেয়া

প্রথমে রূপরেখা তৈরী করে নিবে। কোরআন-হাদীস, তাকলীদ সম্পর্কে তাদের মতামত ও পরিস্কার নির্ধারণ করে নিবে। এ ক্ষেত্রে অত্র রেসালার শুরুতে উল্লিখিত তাদের মূলনীতিগুলো সামনে রাখা যেতে পারে। তাদের সু-নির্দিষ্ট অবস্থানের উপর স্বাক্ষর নিয়ে নিবে। অন্যথায় আলোচনা ও বির্তক , সময় নষ্ট ছাড়া কিছুই হবেনা। (কারণ খালি মাঠে লম্বা লম্বা কথা বলা, তারিখ দিয়ে না আসা, বেকায়দায় পড়লে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা আহলে হাদীসের চিরাচরিত বদাভ্যাস।)

তৃতীয় মূলনীতি: প্রসঙ্গ পরিবর্তনের সুযোগ না দেয়া

বার বার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা আহলে হাদীসের অন্যতম ব্যাধি। কোন মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অবস্থা বেগতিক দেখলে ঝট করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলে। কৌশলে আলোচনার মোড় অন্য মাসআলায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং প্রথম মাসআলার মিমাংসা হওয়ার পূর্বে তাদেরকে কোন ক্রমেই প্রসঙ্গ পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া যাবেনা। সে যতই চেষ্টা করুক আপনি আপন স্থানে অটল থাকবেন।

এমন কি সে অন্য প্রসঙ্গ শুরু করে দিলেও আপনি তাকে প্রথম মাসআলায় ফিরিয়ে আনবেন।

চতুর্থ মূলনীতি: অপ্রাসঙ্গিক কথা-বার্তা থেকে হিকমতের সাথে বারণ করা

অজ্ঞ বা অল্প জ্ঞানী ব্যক্তি দলীল উপস্থাপনের পরিবর্তে গোলমোল করে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। অপ্রাসঙ্গিক কথার আড়ালে আপন অযোগ্যতা ঢাকার প্রয়াস চালায়। চেষ্টা করে বড় আওয়াজ, ধমক এসব দিয়ে হলেও বিজয়ী হওয়া যায় কিনা। হুবহু একই অবস্থা আহলে হাদীসেরও। এজন্য সে যত বিশৃংখলাই করুক না কেন আপনি স্থিরতার সাথে নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়ে আলোচনা পেশ করবেন। সাথে সাথে তাকে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে মর্মে বিনীতভাবে সর্তক করবেন। কোন ক্রমেই সে বিরত না থাকলে, সময় নির্ধারণ করে নিবেন যে, প্রত্যক দল (উদাহরণস্বরূপ) পাঁচ মিনিট, পাঁচ মিনিট করে আলোচনা করবে। এভাবে খুব হিকমতের সাথে আলোচনা শেষ করবেন।

পঞ্চম মূলনীতি: প্রশ্নবানে ঘায়েল করা

বিজ্ঞজনেরা বলেছেন- “আলেমকে দলীল দিয়ে কাহিল করো। আর জাহেলকে প্রশ্ন বানে ঘায়েল করো”। মূলত: আলেমের মাঝে ইলম ও অনুভূতি থাকে। তার মেধা হয় প্রশস্ত। আলেমে মুখলিস- যদি দলীল পান মেনে নিবেন। কিন্তু জাহেল, অনুভূতি হীন। সুতরাং দলীল বুঝা ও দলীল নিয়ে গবেষণা করার যোগ্যতা তার মাঝে নেই। প্রশ্ন করে তার মাঝে অজ্ঞতার অনুভূতি সৃষ্টি করা হলে হয়তবা তিনি মেনে নিতে সম্মত হবেন।

সাম্প্রতিক সময়ের আহলে হাদীস সাধারণত: শরয়ী উসূল ও কানুন সম্পর্কে অজ্ঞ। দু' একটি উর্দূ (বাংলা) পুস্তিকা পড়েই সব কিছু জানার অলীক কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকে। দু'চারজন যারা বুঝেন, তারাও বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার অসৎ নেশায় মত্ত হয়ে আছেন। পক্ষপাতদুষ্ট চরিত্রের কারণে তাদের মাঝে আর অজ্ঞ আহলে হাদীসের মাঝে কোন পার্থক্য থাকেনা। এজন্য আহলে হাদীস আলেম হোক কিংবা জাহেল, তাদেরকে প্রশ্নবানে ঘায়েল করার পন্থাই গ্রহণ করতে

হবে। এ ক্ষেত্রে এমন সব প্রশ্ন নির্বাচন করতে হবে, যার সমাধান কোরআন-হাদীসে সরাসরি উল্লেখ নেই। কিন্তু প্রায়শই আমরা ঐসব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকি।

এমর্মে অধমের (লেখক) معذرت نامہ নামে একটি রেসালা আছে। এ রেসালায় ? میں اہل حدیث کیوں نہیں ہوا তথা কেন আহলে হাদীস হলাম না? শীর্ষক ইশতিহারে এ ধরনের ২৩টি প্রশ্ন রয়েছে। যার সমাধান কোন আহলে হাদীসের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়।

এ ছাড়াও আল্লামা আমীন ছফদার রহ. রচিত مجموعۂ رسائل (রেসালা সমগ্রেও) এ ধরণের হাজারো প্রশ্ন রয়েছে। যা আহলে হাদীসের অন্তসার শুন্য মতবাদের মুখোশ উম্মোচনে অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ। (ইনশাআল্লাহ)।

ষষ্ঠ মূলনীতি: প্রতিপক্ষ কট্টর হলে লিখিত আলোচনা করা

যিনি একদম বেখবর অথবা যিনি সন্দেহে নিপতিত, আহলে সুন্নতের দায়িত্ব হল তাকে বুঝানো। আমাদের আমল, আমলের দলীল, আমাদের চিন্তাধারা তার সামনে তুলেধরা। বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ধোকা এবং হাদীসের উপর আমল করার নামে হাদীস তরকের অসাধু আচরণ সম্পর্কেও তাকে সতর্ক করা। সম্ভব হলে এসব বিষয় তাদের সামনে লিখিতভাবে পরিবেশন করা। একথাও বলে দেয়া যে, কখনো কোন আহলে হাদীসের সাথে আলাপ হলে তিনি যেন আহলে হাদীস থেকে এ মাসআলা সংক্রান্ত সহীহ হাদীস লিখে নেন।

তবে পাক্কা আহলে হাদীস হলে তার সংশোধনের সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। তার উদাহরণ হল-পুড়ে যাওয়া রুটির মত। এজন্য মৌখিক আলোচনা তার ক্ষেত্রে খুব একটা ফলপ্রসূ নয়। তার জন্য কার্যকর পন্থা হল আহলে সুন্নাতের মজবুত দলীলসমূহ তাকে লিখিতভাবে প্রদান করা হবে এবং আহলে হাদীসের আমাল ও মতবাদ সম্পর্কে তার থেকে সহীহ ও মারফু হাদীস ত্বলব করা হবে। সাথে এ শর্ত জুড়ে দেয়া হবে যে, আহলে হাদীস, নিজেদের হাদীসের সিহ্যত এবং আহলে সুন্নতের

দলীলের যুয়ফ তথা হাদীসের মান নির্ণয়ে শুধু সহীহ ও মারফু হাদীসই উপস্থাপন করতে পারবেন। উম্মতের কারো কোন মন্তব্য উল্লেখ করতে পারবেন না। কেননা, রাসূল ব্যতীত কারো কোন বক্তব্য গ্রহণ করা বা তাকলীদ করা তাদের দৃষ্টিতে শিরক।

সপ্তম মূলনীতি: মূলনীতি মানতে বাধ্য করা

কোন আহলে হাদীসের সাথে আলাপ বা বিতর্ক কালে তাদেরকে উসূল মানতে বাধ্য করা হবে। শুরুতে উল্লিখিত তাদের তিন মূলনীতি থেকে এক চুল পরিমাণও সরতে দেয়া যাবেনা। সুতরাং তারা রাসূল সা. ব্যতীত কারো বক্তব্য নকল করলে কিংবা কিয়াস-তাবীল ইত্যাদির আশ্রয় নিলে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে, এসব আপনাদের নীতিবিরুদ্ধ। আপনাদের দৃষ্টিতে এসব শিরক ও শয়তানের কাজ। এসব থেকে বিরত থাকুন এবং শুধু কোরআন-হাদীস পড়ে ও তরজমা করে মাসআলা প্রমাণ করুণ। এর বাহিরে উম্মতের কারো কথাও নকল করা যাবেনা এবং নিজের কথাকেও হাদীস আখ্যা দেয়া যাবেনা।

আহলে হাদীসের অভ্যাস হল-তারা নিজেদের মতকে আল্লাহর বাণী-রাসূলের বাণী তথা কোরআন হাদীস আখ্যা দিয়ে থাকে। সুতরাং খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এক্ষেত্রে করণীয় হল-বিতর্কিত মাসআলা তথা তাদের দাবী কাগজে লিখে তাদের থেকে এমন আয়াত বা সহীহ হাদীস তলব করবেন, যার তরজমা কাগজে লিখিত দাবীর হুবহু অনুরুপ।

অষ্টম মূলনীতি: আলোচনা রেকর্ড করা

আল্লামা আমীন ছফদার রহ: বলেন- আহলে হাদীস আল্লাহকে যতটা ভয় পায়, রেকর্ডারকে তার থেকেও বেশী ভয় পায়। এজন্য তাদের সাথে আলাপ কালে রেকর্ডার চালু করে নিবেন। রেকর্ডারের ভয়ে হলেও আশা করা যায় তারা অশ্লীল, অসত্য কথা থেকে বিরত থাকবে।

আহলে হাদীসের সাথে পাঁচটি মুনাযারা

প্রথম মুনাযারাঃ হাদীসের সংজ্ঞা সম্পর্কে

আমি (লেখক) এক আহলে হাদীস আলেমকে বললাম- আপনি হাদীসের সংজ্ঞা বলেন।

তিনি বললেন- রাসূল সা. এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলা হয়।

আমি বললাম-আপনি কোরআনের এমন আয়াত কিংবা এমন কোন হাদীস পড়েন, যার অনুবাদ, আপনি যে সংজ্ঞা করেছেন, তার হুবহু অনুরূপ।

তিনি বললেন- এমন কোন আয়াত কিংবা হাদীস নেই।

আমি বললাম- তাহলে আপনি এ সংজ্ঞা কোথায় পেলেন?

তিনি বললেন- মুহাদ্দিসীন অনুরুপ বলেছেন।

আমি বললাম- আপনি মুহাদ্দিসীনের তাকলীদ করেছেন। সুতরাং আপনি এমন একটি হাদীস বলেন, যাতে রাসূল সা. বলেছেন- ফুকাহার তাকলীদ শিরক। কিন্তু মুহাদ্দিসীনের তাকলীদ শিরক নয়।

তিনি বললেন- এমন কোন হাদীস নেই।

তখন আমি বললাম- আপনাদের নিকট তাকলীদ হল শিরক। সুতরাং আপনি যেহেতু মুহাদ্দেসীনের তাকলীদ করেছেন। আপনিও শিরক করেছেন। এ শিরক থেকে আপনাকে তওবা করতে হবে এবং আপনার বিবাহও দোহরাতে হবে।

দ্বিতীয় মুনাযারা : সুন্নতের সংজ্ঞা সম্পর্কে

এক আহলে হাদীস মুনাযের (তার্কিক) থেকে জিজ্ঞাসা করা হল- আপনি সুন্নাতের সংজ্ঞা বলেন।

তিনি বললেন- হাদীস ও সুন্নত একই।

আমি একথা কাগজে লিখে তাকে বললাম- আপনি এমন কোন আয়াত বা হাদীস বলেন-যাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সুন্নত এবং হাদীস একই জিনিষ।

তিনি বললেন- একথা কোরাআনেও নেই, হাদীসেও নেই।

আমি বললাম- আপনি যা বললেন-তাতো নবীর কথা নয়। বরং উম্মতের কারো না কারো মত। আর আপনাদের মূলনীতি অনুযায়ী ধর্মীয় কাজে উম্মতের মত গ্রহণ করা শয়তানের কাজ। সাথে সাথে সুন্নত ও হাদীস যদি একই হয়, আহলে হাদীস তো হাজারো সুন্নত তরক করছে। কেননা

১. হাদীস শরীফে এসেছে-এক মহিলা রাসূল সা. এর নির্দেশে একজন বালেগ পুরুষকে দুধ পান করিয়েছিলেন। অথচ আহলে হাদীস পুরুষ-মহিলা দুধ পান করা ও করানোর এ সুন্নত থেকে বঞ্চিত।

২. হাদীসে আছে- রাসূল সা. কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। অথচ আহলে হাদীস পুরুষ-মহিলা এ সুন্নতের অনুসরণ করেনা।

৩. হাদীসে আছে-রাসূল সা. উযুর পর স্ত্রীকে চুম্বন করেছেন। এরপর এসে নামায পড়িয়েছেন। অথচ আহলে হাদীস ইমাম-মুক্তাদী এ সুন্নাতের ব্যাপারে উদাসীন।

৪. হাদীসে আছে-রাসূল সা. তাঁর নাতী উমামাকে কাঁধে তুলে নামায পড়েছেন। অথচ আহলে হাদীস সন্তানদেরকে মসজিদেও আনেনা, কাঁধে তুলে নামাযও পড়েনা। আল্লাহ আপনাদেরকে মৃত সুন্নাতগুলো জিন্দা করার তাওফীক দান করুক।

অবস্থা বেগতিক দেখে বলতে লাগল- রাসূল সা. এর ত্বরীকাকে সুন্নত বলা হয়।

আমি বললাম-আপনি এমন কোন আয়াত পড়েন বা হাদীস শোনেই, যার তরজমা হল-রাসূল সা. এর ত্বরীকাকে সুন্নত বলা হয়।

সে বলল- এ মর্মে কোন আয়াত বা হাদীস নেই।

বললাম- তাহলে তো এটা উম্মতের কথা। যা আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। সাথে সাথে উপরে যে চারটি সুন্নত উল্লেখ করা হল, আহলে হাদীস সেগুলো বর্জন করে থাকে।

পেরেশান হয়ে সে বলতে লাগল- সুন্নত ঐ ত্বরীকাকে বলা হয় যা রাসূল সা. এর সাথে খাছ নয়।

বললাম- এ মর্মে কোন আয়াত বা হাদীস পাঠ করেন। এবং এমন চাঁরটি হাদীস শোনেই যাতে রাসূল সা. উক্ত চার বিষয়কে নিজের জন্য খাছ বলেছেন। অন্যথা আপনার উচিৎ নিজস্ব মত ও উম্মতের মত বর্জন করে সুন্নতে রাসূলের প্রতি মনোনিবেশ করা।

সে বলল- সুন্নত রাসূল সা. এর ঐ ত্বরীকাকে বলা হয়, যার উপর স্বয়ং আমল করেছেন এবং উম্মতকে আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বললাম- এ মর্মে এমন কোন আয়াত কিংবা হাদীস শোনেই। যার তরজমা আপনার বক্তব্যের অনুরূপ এবং এমন হাদীস শোনেই, যাতে রুকুর আগে, রুকুর পরে এবং তৃতীয় রাকআতের শুরুতে হাত উত্তোলনের নির্দেশ রয়েছে এবং ঐ সকল হাদীসও শোনেই যার মধ্যে খালি মাথায় নামায পড়া, ফরযের ছয় রাকাতে আমীন উচ্চস্বরে এবং ১১ রাকাতে আমীন নিচুস্বরে বলা, বুকের উপর হাতবাঁধা ও নামাযে পা ছড়িয়ে দাঁড়ানো ইত্যাদির নির্দেশ রয়েছে।

অপারগ হয়ে সে বলল- আমি তাহকীক করব।

বললাম- 'খুঁজে দেখব' কথার অর্থ হল, এখন পর্যন্ত আপনি তাকলীদ করছেন। আর তাকলীদ আপনাদের নিকট শিরক। সুতরাং তাহকীক পরে করলেও চলবে, তার আগে আপনি তাকলীদের গুনাহ থেকে তওবা করুন এবং বিবাহ দোহরায়ে নিন।

সে বলল- তাহলে আপনি সুন্নতের সংজ্ঞা বলুন।

বললাম- এমন তরীকাকে সুন্নত বলা হয় যা রাসূল সা. অথবা খুলাফায়ে রাশেদীন চালু করেছেন।

সে বলল- এমন কোন আয়াত কিংবা হাদীস পড়ুন, যাতে এ সংজ্ঞা উল্লেখ আছে।

বললাম- সংজ্ঞা কোরআন-হাদীসে থাকেনা। বরং সংজ্ঞা বিশেষজ্ঞরা করে থাকেন। সুন্নতের এ সংজ্ঞা, ফুকাহায়ে কেরাম করেছেন। আমরা তাদের থেকে এ সংজ্ঞা গ্রহণ করেছি।

তৃতীয় মুনাযারাঃ কালেমায়ে তায়্যেবা সম্পর্কে

আহলে সুন্নাতের কয়েকজন যুবক আহলে হাদীসের কয়েকজন আলেম কে বলল- কালেমায়ে তায়্যেবা- **لا إله إلا الله محمد رسول الله** হুবহু এভাবে, একসাথে কোরআন কিংবা সহীহ, মারফু, হাদীস থেকে দেখান যে হাদীসে রাসূল সা. এ কালেমা সাহাবায়ে কেরামকে শিখিয়েছেন এবং উম্মতকে শিখানোর নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথা আপনারা ঘোষণা করুন কিংবা লিখেদিন যে, এ কালেমা ভুল।

তাদের একজন বলল-মূলতঃ কালেমায়ে তয়্যেবা পতাকায় লেখার জন্য। আর কালেমায়ে শাহাদাৎ পড়ার জন্য।

কথাটি যুবকদের একজন কাগজে লিখে নিয়ে বলল- আপনি এমন একটি হাদীস লিখে দিন যার দ্বারা আপনার উক্ত কথাটি প্রমাণিত হয়। আর যদি এমর্মে কোন হাদীস না থাকে, তাহলে এটা আপনাদের নিজস্ব মত। আপনারা যেখানে সরাসরি ওহী নয়, রাসূল সা. এর এমন বাণী পর্যন্ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। সেখানে আমরা কিভাবে আপনাদের মত গ্রহণ করব?

চতুর্থ মুনাযারাঃ হাত উত্তোলনের হাদীস সম্পর্কে

"হাদীস ও ফিকহ সংরক্ষণ কমিটির" এক যুবক আহলে হাদীসের এক শায়খুল হাদীসের নিকট গিয়ে বলল-হুজুর! রুকুতে গমনকালে হাত উত্তোলন সম্পর্কে কি কোন সহীহ হাদীস আছে?

শায়খুল হাদীস সাহেব বললেন-অগণিত।

যুবক বলল- হুজুর! আমাকে একটি হাদীস লিখে দিন। শায়খুল সাহেব ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটি লিখে দিলেন।

যুবক বলল- হুজুর! ইবনে মাসউদ র. থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে তো হাত উত্তোলন না করার কথা বুঝা যায়।

একথা শুনে শায়খুল হাদীস সাহেব গোস্সায় ফেটে পড়লেন। অবজ্ঞার সুরে বললেন- ও হাদীস যয়ীফ! যয়ীফ!

যুবক বলল- হুজুর! ইবনে ওমর রা. এর হাদীসকে সহীহ, ইবনে মাসউদের হাদীসকে যয়ীফ, আল্লাহ বলেছেন না রাসূল সা.?

শায়খুল হাদীস সাহেব বললেন- হাদীস সহীহ কিংবা যয়ীফ হওয়ার ফায়সালা আল্লাহও করেন না, রাসূল সা.ও করেননা। বরং মুহাদ্দিসীনে কেরাম করে থাকেন। তারা যে হাদীসকে সহীহ বলেন আমরা তার উপর আমল করি। আর যে হাদীসকে যয়ীফ বলেন আমরা সে হাদীস তরক করি।

যুবক বলল- হুজুর! আপনাদের নিকট তো সরাসরি ওহী না হলে, রাসূল সা. এর কথাও গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ আপনারা মুহাদ্দিসীনের কথা অনুযায়ী আমল করছেন। হাদীস সহীহ কিংবা যয়ীফ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের তাকলীদ করছেন। আবার আপনারাই বলেন- তাকলীদ হল শিরক। সুতরাং আপনারা আর আহলে হাদীস নেই। বরং আপনাদের পরিচয় হওয়া উচিৎ আহলে শিরক, আহলে রায় (মত)।

পঞ্চম মুনাযারাঃ হাত উত্তোলন না করলে নামায বাতিল হওয়ার সম্পর্কে

“হাদীস ও ফিকহ্ সংরক্ষণ কমিটির” অন্য এক যুবক এক আহলে হাদীস মুফতি সাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করল-হুজুর! হাত উত্তোলন ব্যতীত নামায আদায় করলে হুকুম কী হবে?

মুফতী সাহেব বললেন- নামায বাতিল হয়ে যাবে।

যুবক বলল- হাত উত্তোলন না করলে যদি নামায বাতিল হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত আহলে হাদীসের নামায বাতিল।

মুফতী সাহেব বললেন-কীভাবে?

যুবক বলল-আহলে হাদীসের বরেণ্য মুহাদ্দিস নাছিরুদ্দিন আলবানী তার صفة الصلاة নামক কিতাবের- ১২১, ১৩৩, ১৩৫ ও ১৩৬ নং পৃষ্টার লিখেছেন যে, সিজদার পূর্বে ও পরে হাত উত্তোলন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এবং ১২১ নং পৃষ্টার স্বলিখিত টীকায় তিনি লিখেছেন সিজদার সময় হাত উত্তোলনের হাদীস ১০জন সাহাবা থেকে বর্ণিত।

বুঝা গেল আলবানী সাহেবের তাহকীক অনুযায়ী সিজদার আগে-পরে হাত উত্তোলন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং হাত উত্তোলন না করলে যদি নামায বাতিল হয়, সিজদার সময় হাত উত্তোলন না করার কারণে আহলে হাদীসের নামাযও বাতিল হয়ে যাবে।

মুফতি সাহেব বললেন-ইবনে ওমর রা. এর হাদীস থেকে বুঝা যায় রাসূল সা. সিজদার সময় হাত উত্তোলন করতেন না।

যুবক বলল- হুজুর! ব্যাপারটা তো ঘোলাটে হয়ে গেল। কেননা, হাত উত্তোলনের হাদীস পরস্পর বিরোধী। আলবানী সাহেবের তাহকীক অনুযায়ী, সিজদার সময় হাত উত্তোলনের” হাদীস ১০জন সাহাবী থেকে বর্ণিত, আর আপনার বক্তব্য অনুযায়ী ইবনে ওমর রা. এর হাদীস এ সময় হাত উত্তোলন থেকে নিষেধ করে। তো আপনি এ বিরোধ সম্পর্কে রাসূল সা. এর ফায়সালা বলে দিন।

মুফতী সাহেব বললেন- আসল কথা হল সিজদার সময় হাত উত্তোলনের বিষয়টি প্রথমে ছিল। পরে রহিত হয়ে গেছে।

যুবক- মুফতী সাহেবের এ বক্তব্য কাগজে লিখে নিল। এরপর বলল হুজুর! এ ফায়সালা রাসূল সা. এর, না আপনার, না রাসূলের কোন উম্মতের?

যদি রাসূল সা. এর হয়, তো হাদীস বলেন। যার মধ্যে এ ফয়সালা উল্লেখ আছে। যদি আপনার হয়, তো শরয়ী মাসআলায় নিজের মত যোগ করেছেন। যা শয়তানের কাজ। আর যদি রাসূলের অন্য কোন উম্মতের হয়, তো আপনি তার তাকলীদ করেছেন। আর আপনাদের নিকট তাকলীদ হল শিরক। সরাসরি ওহী না হলে যেখানে নবীর মতই গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে আপনার কথার কী মূল্য আছে?

এ পাঁচ বিতর্ক থেকে স্পষ্ট হয় যে, আহলে হাদীস কতটা ধূর্ত। তারা আহলে হাদীস সাইন বোর্ডের আড়ালে আপন মত-মন্তব্যকে হাদীস কোরআন নামে আখ্যায়িত করে থাকে। العياذ بالله

১২টি বিতর্কিত মাসআলার সমাধান, চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার

প্রথম মাসআলা: দু'হাতে মুছাফাহা

প্রশ্ন : মুছাফাহা এক হাতে সুন্নত না দুই হাতে?

উত্তর: ইমাম বুখারী রহ. বুখারী শরীফে (খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৯২৬) এ মাসআলাটি দু'পরিচ্ছেদে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। **باب المصافحة** এ পরিচ্ছেদে, মুছাফাহা সুন্নত প্রমাণ করার জন্য চারটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এরপর **باب الأخذ باليدين** এ পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী রহ. মুছাফাহার পদ্ধতি আলোচনা করেছেন।

মুছাফাহা সুন্নত বিষয়ক চারটি হাদীস নিম্নরূপ:

প্রথম হাদীস : **قال ابن مسعود رض علمنى النبى التشهد و كفى بين كفيه**

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন- রাসূল সা. আমাকে 'তাশাহুদ' শিখিয়েছেন। তখন আমার হাত রাসূল সা. এর দু'হাতের তালুদ্বয়ের মাঝে ছিল। (অর্থাৎ মুছাফাহা অবস্থায়) (বুখারী শরীফ- ২/৯২৬)

দ্বিতীয় হাদীস:

قال: كعب بن مالك رضى الله عنه: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه و سلم فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحنى و هنأنى

কা'ব ইবনে মালেক রা. বলেন- একদা আমি মসজিদে আসলাম। দেখলাম রাসূল সা. মসজিদে উপস্থিত আছেন। তখন ত্বলহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ দাঁড়িয়ে আমার সাথে মুছাফাহা করলেন এবং অভিনন্দন জানালেন। (প্রাগুক্ত)

তৃতীয় হাদীস:

عن قتادة قلت لأنس أكانت المصافحة فى أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم؟ قال: نعم

কাতাদা রহ. আনাস রা. থেকে জিজ্ঞাসা করলেন- সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কি মুছাফাহার প্রচলন ছিল? আনাস রা. জবাব দিলেন- হ্যাঁ ছিল। (প্রাগুক্ত)

চুর্তথ হাদীস:

قال (عبد الله بن هشام:) كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم و هو أخذ بيد عمر بن الخطاب رض

আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম রা. বলেন- আমরা রাসূল সা. এর সাথে ছিলাম। তখন রাসূল সা. ওমর রা. এর হাত ধরে রেখেছিলেন। (অর্থাৎ মুছাফাহা অবস্থায় ছিলেন)। (প্রাগুক্ত)

এ চার দলীলের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, মুছাফাহা করা সুন্নত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী রহ. রাসূল সা. এর মুছাফাহার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যে,মুছাফাহা দু'হাতে করতে হবে। একে অপরের হাত ধরবে। শুধু হাতের সাথে হাত মিলানোর নাম মুছাফাহা নয়। কেননা করমর্দনের সময় একে অন্যের হাত ধরার মাঝে ভালবাসা প্রকাশ পায়। বরং পরস্পরের প্রতি মহব্বতের গভীরতা হিসাবে হাতের বন্ধন দৃঢ় কিংবা হালকা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী রহ. দু'হাতে মুছাফাহা সুন্নত হওয়ার প্রমাণ হিসাবে তাবয়ে তাবেয়ীনের আমল উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন-

وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه

অর্থাৎ হাম্মাদ ইবনে যায়দ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের সাথে দু'হাতে মুসাফাহ করেছেন। (প্রাগুক্ত)

উভয় বাবের সারাংশ ও বুখারীর ইমাম মাকসাদ:

প্রথমে ইমাম বুখারী রহ. ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীস সহ চারটি হাদীস উল্লেখ করে 'মুছাফাহা' সুন্নত প্রমাণ করেছেন। ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীসে বলা হয়েছিল রাসূল সা. উভয় হাতে তার হাত ধরেছিলেন। দ্বিতীয় বাবে ইমাম বুখারী রহ. দু'হাতে মুছাফাহার স্পষ্ট হাদীস এনে বুঝাতে চেয়েছেন যে, প্রথম বাবে যে মুছাফাহা সুন্নত প্রমাণিত হয়েছিল তার পদ্ধতি হল- দু'হাতে করতে হবে। একে অন্যের হাত ধরতে হবে। এভাবে করলে পরস্পরের প্রতি মহব্বতের বহি: প্রকাশ ঘটে। শুধু হাতে হাত মিলানো কিংবা হাতের উপর হাত রেখে

দেয়ার নাম মুছাফাহা নয়। (এরপরও ইমাম বুখারীর অন্ধগুণগ্রাহী আহলে হাদীস দু'হাতে মুছাফাহা করতে একদম রাজি নয়।)

কারণ, কিছু মুসলমান হিন্দু সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিনা দ্বিধায় হিন্দুয়ানী নিয়ম-নীতি অনুকরণ করছে এবং তাদের আচার-আচরণকে সুন্নত নামে অভিহিত করছে। অনুরূপ ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহভোগী এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দুগ্ধপোষ্য একদল মানুষও আপন গুরু ইংরেজের কিছু চলন স্বযত্নে গ্রহণ করেছে । তারা খালি মাথায় চলা-ফেরা এবং টুপি খুলে অথচ জুতা পরে নামায পড়াকে ফ্যাশান বরং গৌরব মনে করে । ইংরেজী তরীকাকে সুন্নত আর নবীর তরীকাকে বিদায়াত বলতেই তারা বেশী পছন্দ করে।

আহলে হাদীসের অভ্যাস ও ধোঁকা:

(আহলে হাদীসের চিরাচরিত অভ্যাস হল, আপনি কোন মাসআলা দলীল প্রমাণ দিয়ে যতই প্রমাণ করুন না কেন মতবাদের বিপরীত হলে বেঁকে বসবে । তারা হাদীস অনুসরণের নামধারী হয়েও হাদীস তরক করতে একদম কুণ্ঠিত হবেনা । বরং আপনাকে বোকা বানানোর জন্য হাজারো ধোকার জালে আবদ্ধ করার চেষ্টা করবে। এ মাসআলা সংকান্ত কয়েকটি ধোকা জওয়াব সহ নিম্নে তুলে ধরা হল:)

ধোকা নম্বর ১:

রাসূল সা. এর দু'হাত ছিল ঠিক কিন্ত ইবনে মাসউদ রা. এর তো এক হাত ছিল?

জওয়াব:

১. (ইবনে মাসউদ রা. এর এক হাত ছিল, তো কী হয়েছে?) রাসূল সা. এর তো দু'হাত ছিল। আমরাতো রাসূল সা. এর সুন্নত অনুসরণ করব। (আর আপনাদের নিকট তো উম্মতের কথা-কাজ বিলকুল হুজ্জত নয়।)

২. দু'হাতে মুছাফাহ করার সময় দ্বিতীয় জনের উভয় হাতের মাঝে প্রথম জনের এক হাতই থাকে। আরেক হাত থাকে দু'হাতের বাহিরে। এজন্য উভয় হাতে মুছাফাহাকারী বলতে পারে আমার হাত তার দু'হাতের মাঝে ছিল। ইবনে মাসউদ রা. এর ব্যপারটা অনেকটা এরকম। বরং এ রকমই। কারণ, এটা কীভাবে সম্ভব যে, রাসূল সা. তার সাথে দু'হাতে মুছাফাহা করেছেন। আর তিনি করেছেন এক হাতে। বড় ও ছোটর মুছাফাহার একটি দৃশ্য কল্পনা করলেও এ দৃশ্যটি বড় বেমানেই বরং বেয়াদবীপূর্ণ বলে মনে হবে। তো নবী আর উম্মতের মাঝে এমন দৃশ্য কিভাবে কল্পনা করা যায়?

৩. মেনেও যদি নেয়া হয় যে, ইবনে মাসউদ রা. তার একহাতের কথাই বলেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি একহাতে মুছাফাহা করছেন। বরং উদ্দেশ্যে হল- মোছাফাহার প্রাক্কালে তার যে হাত রাসূল এর মোবারক হাতদ্বয়ের মাঝে ছিল তার খোশনসীবী এবং বৈশিষ্ট উল্লেখ করা। আপন হাতের এ দারুন সৌভাগ্যে খুশী প্রকাশ করা।

ধোকা নম্বর-২

মোছাফাহার অর্থ হল- একজনের হাতের তালু অপর জনের হাতের তালুর সাথে মিলিত হওয়া। সুতরাং মুছাফাহা শব্দের দাবীই হল একহাতে হওয়া।

জওয়াব:

দু'হাতে মুছাফাহা করা হলে কি এক জনের হাতের তালু অন্য জনের হাতের তালুর সঙ্গে মিলিত হয় না? আবার দু'হাতে মুছাফাহা করা হলে পরস্পরের দু'হাতের তালুইতো একত্রিত হয়। চার হাতের তালুতো নয়।

ধোকা নম্বর-৩

কোন কোন হাদীসে يد (হাত) শব্দ এসেছে। يد হল একবচন। বুঝা গেল মুছাফাহা একহাতে হবে, দু'হাতে নয়।

জওয়াব:

কোরআন-হাদীস বুঝার জন্য সংশ্লিষ্ট আরো অনেক ইলমে পারদর্শী হতে হয়। পাশাপাশি আরবী ভাষার প্রাচীন পরিভাষা ও বাকরীতি সম্পর্কেও অবগত হওয়াও অপরিহার্য। (উল্লিখিত কথাটি ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানও না থাকার পরিচায়ক) সব ভাষায় এক বচনের শব্দ দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা:-

১. কোন বস্তুর একক বুঝানোর জন্য।

২. কোন বস্তুর শ্রেণী বা জাতি বুঝানোর জন্য।

দ্বিতীয় ব্যবহারে শব্দ একবচন হলেও ঐ বস্তুর একাধিক একক উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন আমরা বলি- আমাকে আঙ্গুর দাও। বরই দাও। এর অর্থ এই নয় যে, আমাকে একটা আঙ্গুর দাও। একটা বরই দাও।

আমরা যখন বলি- আমি নিজের চোখে তোমাকে দাঁড়ানো দেখেছি, নিজ কানে তোমার কথা শুনেছি, তখন এ উদ্দেশ্য হয় না যে, এক চোখে দেখেছি কিংবা এক কানে শুনেছি। অনুরূপ আরবী ভাষায়ও এক বচনের শব্দ দু অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন রাসূল সা. এক দু'আয় বলেছেন-

اللهم اجعل فى بصرى نورا و اجعل فى سمعى نورا-

হে আল্লাহ! আমার চোখে নূর পয়দা কর, আমার কানে নূর পয়দা কর।

অন্য এক হাদীসে রাসূল সা. বলেন-

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

মুসলমান সে, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

রাসূল সা. বলেন-

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অশোভন কিছু ঘটতে দেখে তার উচিৎ নিজ হাতে তা প্রতিহত করা।

এসব হাদীসেও একবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু নিশ্চিত এ উদ্দেশ্য নয় যে, আল্লাহ! আমার এক চোখে নূর পয়দা কর, আমার এক কানে নূর পয়দা কর, যার এক হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে, এক হাতে দিয়ে প্রতিহত করা উচিৎ। বরং একবচনের শব্দ ব্যবহার করে সমশ্রেণীই উদ্দেশ্য।

অনুরূপ ইবনে মাসউদ রা. এর মুছাফাহার হাদীসেও সমশ্রেণী উদ্দেশ্য। হাদীস শরীফে এসেছে- মোছাফাহার দ্বারা (হাতের) গুনাহ মাফ হয়। গুনাহ কি শুধু এক হাত দিয়েই করা হয়?

বুখারী, বুখারী বলে শ্লোগান এবং ইমাম বোখারীর বিরুদ্ধে অবস্থান:

(আহলে হাদীস কথায় কথায়- বোখরী শরীফ, বোখারী শরীফ বলে থাকে। আপনি কোন হাদীস বলা মাত্র প্রশ্ন করবে- বোখারী শরীফে আছে কিনা? বোখারী শরীফের হাদীস না হলে তারা একদম মানতে

রাজী নয়। এর থেকে তাদের নিকট বুখারী শরীফ ও ইমাম বুখারীর সীমাহীন মর্যাদা বুঝা যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল আহলে হাদীস আপন মতবাদবিরুদ্ধ হলে বুখারী শরীফের হাদীস প্রত্যাখান করতেও কুণ্ঠিত হয়না। এমনকি ইমাম বুখারীর উপর আপত্তি উত্থাপনেও দ্বিধা করেনা। মানে-স্বার্থ টিকলে ইমাম বুখারী ছাড়া কাউকে চিনি না, না টিকলে ইমাম বুখারীকেও মানিনা। একারণেই) ইমাম বুখারী রহ. باب المصافحه এ ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীস উল্লেখ করে মুসাফাহা সুন্নত প্রমাণ করেছেন। কিন্তু হাকীম মুহাম্মদ ইসরাঈল সালাফীসহ অনেক আহলে হাদীস ইমাম বুখারীর উক্ত পরিচ্ছেদের (باب المصا فحة) উপযুক্ততা অস্বীকার করেন। ইসরাঈল সালফী সাহেব তার التحفة الحسنى নামক কিতাবের ৩৯ নং পৃষ্ঠায় লিখেন- এ হাদীসের সাথে মুসাফাহার বিন্দু মাত্র সম্পর্কও নেই।

হাকীম সাহেব এ কথার তীর হানাফীদের দিকে রেখে ইমাম বুখারী রহ. কেও চরম ধোলাই করেছেন। তিনি التحفة الحسنى নামক কিতাবের ৩৮নং পৃষ্ঠায় লিখেন- আশ্চর্য লাগে মুকাল্লেদীন আহনাফের উপর। তারা যে সব হাদীসে সহীহ দ্বারা মুছাফাহা সুন্নত প্রমাণিত, সেগুলো অস্বীকার করে। আর যেসব হাদীস সহীহ নয়, তা দ্বারা মুছাফাহা সুন্নত প্রমাণ করার অযথা চেষ্টা করে। আর বুখারী শরীফের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে ধোকা দেয়ার কোশেশ করে। তাদের জেনে রাখা উচিৎ-এর নাম হাদীস জানা কিংবা বুঝা নয়। বরং এটা রাসুলের হাদীসের সাথে এক প্রকার ঠাট্টা।

আহলে হাদীস না শিয়া!

(باب الأخذ باليدين এ বাবের দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য ছিল- মুছাফাহার নিয়ম শিখানো, মুছাফাহা দু'হাতে সুন্নত এটা প্রমাণ করা) প্রমাণ হিসাবে তিনি 'খাইরুল কুরুনের' দু'জন মহান মনীষী ও মুহাদ্দিস হাম্মাদ ইবনে যায়দ ও আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর দু'হাতে মুছাফাহার আমল উল্লেখ করেছেন। (কিন্তু আপন মতবাদের খেলাফ

বিধায় এ আমল হাকীম সাহেবের একদম সহ্য হয়নি। তাই এমন ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন যে, তা শুধু ঐ দু'জকেই নয়, বরং সাহাবায়ে কেরামকেও আহত বরং যখম করেছে) তিনি লিখেন- সাহাবীদের কথা যেখানে দলীল নয়; সেখানে তাবেয়ীনের কথা কিভাবে দলীল হতে পারে?

আহলে হাদীস ও ইমাম বুখারী

তাবয়ে তাবেয়ীনের দু'জনের আমলের দ্বারা দলীল পেশ করণ, এ কথার প্রমাণ যে, ইমাম বুখারী রহ. সাহাবা রা. তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীন সকলকে মানতেন এবং সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতেন। কিন্তু আহলে হাদীস সরাসরি ওহী না হলে রাসূলের কথা মানতেও রাজী নয়। (দেখুন ত্বরীকে মুহাম্মদী পৃ: ৫৭) সুতরাং আহলে হাদীসের না বুখারী শরীফের সাথে সম্পর্ক আছে না ইমাম বুখারীর সাথে। (না হাদীসে রাসূলের সাথে) বরং (তারা বুখারী, বুখারী করলেও) তাদের পথ আর ইমাম বুখারীর পথ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।

আহলে হাদীস সমীপে তিনটি প্রশ্ন:

১. ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে হাদীসে ইবনে মাসউদের রা . দ্বারা মুছাফাহা প্রমাণিত। আহলে হাদীসের দৃষ্টিতে প্রমাণিত নয়। কোনটি সঠিক?

২. হাম্মাদ ইবনে যায়দ এবং আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক দু'হাতে মুছাফাহা করার কারণে বিদয়াতী হয়েছেন নাকি হন নি?

৩. ক. ইমাম বুখারী রহ. এই দুইজন তাবয়ে তাবেয়ীনের আমল উল্লেখ করে দু'হাতে মুছাফাহা সুন্নত প্রমাণ করেছেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাদের তাকলীদ করেছেন। এ তাকলীদের কারণে ইমাম বুখারী মুশরিক হয়েছেন না হন নি?

খ. ইমাম বুখারী রহ. বুখারী শরীফে অজস্র সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনের উক্তি ও আমল উল্লেখ করেছেন। যা পড়ে আজও কোটি মুসলমান আমল করছে। এর দ্বারা ইমাম বুখারীর শিরকের গোনাহ হচ্ছে কিনা?

গ. বুখারী শরীফে এহেন শিরক থাকা অবস্থায় ইমাম বুখারী রহ. বুখারী শরীফ লিখে গুনাহের কাজ করেছেন না নেকীর?

প্রথম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুদের প্রতি আহ্বান হল-তারা যদি

১. এমন সহীহ, সরীহ, মারফু, মুত্তাসিল হাদীস দেখাতে পারে যাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, রাসূল সা. মুছাফাহা কালে বাম হাত দূরে সরিয়ে রাখার হুকুম দিয়েছেন বা রাসূল সা. শুধু ডান হাতে মুছাফাহা করেছেন এবং বাম হাত দুরে সরিয়ে রেখেছেন অথবা কোন সাহাবী বা তাবেয়ী এমন করেছেন এবং

২. উম্মতের কারো মত বা উক্তির তাকলীদ ব্যতীত উক্ত হাদীসকে সহীহ প্রমাণ করতে পারে;

তাহলে আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

দ্বিতীয় মাসআলা: খালি মাথায় নামায পড়া

প্রশ্ন: খালি মাথায় নামায পড়ার বিধান কী?

উত্তর: খালি মাথায় নামায পড়ার কয়েক সূরত হতে পারে। যেমন:-

১. অনিবার্য কোন কারণে হলে, জায়েয। মাকরূহও হবেনা।

২. অলসতা করে কোন সময় পড়লে, মাকরূহে তানযিহী হবে। ছওয়াব কম হবে।

৩. খালিমাথায় নামায পড়াকে সুন্নত মনে করা ব্যতীত অভ্যাসে পরিণত করলে মাকরূহে তাহরীমি হবে।

৪. খালি মাথায় নামায পড়াকে উত্তম ও সুন্নত এবং মাথা ঢেকে নামায আদায় করাকে তুচ্ছ মনে করা, কুফর।

(দেখুন, আলমগীরি খ:১ পৃ:১০৬, দুররে মুখতার খ:১ পৃ:৪৭৪, রদ্দুল মুহতার খ:১ পৃ:৪৮২, কাযীখান খ:১ পৃ:১১৮)

কোরআন শরীফে এসেছে:- **خذوا زينتكم عند كل مسجد**

অর্থ: নামাযের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর।

যেহেতু টুপি এবং পাগড়ীও পোষাকের অন্তর্ভুক্ত, এজন্য নামাযের সময়, টুপি ও পাগড়ী পরিধান করা উচিৎ। **مصنف ابن أبي شيبة** নামক হাদীসের কিতাবে **باب من كان يسجد على كور العمامة ولايرى به بأسا** (অর্থাৎ ঐ

সমস্ত লোকের দলীল যাদের নিকট পাগড়ীর প্যাঁচের উপর সিজদা করা কোন সমস্যা নয়) শিরোনামে একটি বাব রয়েছে। এ বাবে আটটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরের বাব হল باب من كره السجود على كور العمامة (ঐ সকল লোকের দলীল যারা পাগড়ীর প্যাঁচের উপর সিজদা করা মাকরূহ মনে করেন।) এবাবে ১২টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। শুধু এ দু' বাবের ২০টি হাদীসের প্রতি খেয়াল করলেও বুঝা যায় যে, সুন্নত তরীকা হল মাথা ঢেকে নামায আদায় করা।

আহলে হাদীসের তাহকীক :

১. জামায়াতে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা, শামসুল ওলামা, শায়খুলকুল ফিল কুল মিঁয়া নযীর হুসাইন সাহেব বলেন- জুমার নামায হোক কিংবা অন্য কোন নামায, রাসূল সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম পাগড়ী বেঁধে আদায় করতেন। আহকামুল হাকিমীন রাব্বুল আলামীন তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার নিয়ম শিখিয়েছেন যে, তোমরা পোষাক আবৃত হয়ে নামায আদায় কর। আর পোশাকের মাঝে পাগড়ীও অর্ন্তভুক্ত। কেননা পাগড়ী সুন্নত পোষাক হিসাবে প্রমাণিত। (ফাতওয়ায়ে নযীরিয়্যাহ- খ:৩ পৃ:৩৭২)

২. আহলে হাদীসের প্রসিদ্ধ আলেম সায়্যেদ দাউদ গজনবী সাহেব এবং আব্দুল জব্বার গজনবী সাহেব বলেন-ইসলামের প্রাথমিক সময়ে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন ছিল। তাদের কাপড়ের কমতি ছিল। অধমের দৃষ্টিতে এমন কোন রেওয়ায়েত অতিবাহিত হয়নি, যাতে উল্লেখ আছে যে, এ অবস্থা দূর হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে বিশেষত: জামায়াতের নামায খালি মাথায় আদায় করেছেন। অভ্যাস বানিয়ে নেয়ার তো কোন প্রশ্নই আসেনা। এজন্য এ বদ-রসম, যা দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে বন্ধ করা উচিৎ। যদি ফ্যাশন হিসাবে খালি মাথায় নামায আদায় করা হয় তো মাকরূহ হবে। যদি বিনয় প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে হয় নাসারাদের সাথে মিল হবে। যদি অলসতার কারণে হয়, তা হবে মুনাফিকের চরিত্র। মোটকথা যে কারণেই হোক না কেন সব দিক থেকেই এটি একটি অপছন্দনীয় আমল। (ফাতাওয়ায়ে ওলামায়ে হাদীস- খ:৪ পৃ:২৯০/২৯১)

৩. শায়খুল ইসলাম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসারী সাহেব বলেন। নামাযের সহীহ ও মাসনূন ত্বরীকা ওটাই, যা রাসূল সা. এর সার্বক্ষণিক সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত। অর্থ্যাৎ শরীর কাপড় দিয়ে এবং মাথা কাপড় কিংবা টুপি দিয়ে ঢাকা থাকবে।
(ফাতওয়ায়ে ছানাইয়্যা- খ:১ পৃ:৫২৪)

৪. শায়খুল হাদীস মাওলানা ইসমাঈল সালাফী সাহেব বলেন- মোট কথা কোন হাদীস দ্বারাই রাসূল সা. এর ওযর ব্যতীত খালি মাথায় নামায পড়াকে অভ্যাসে পরিণত করা প্রমাণিত নয়। শুধুমাত্র বে আমলী, বা বদ আমলী কিংবা অলসতার কারণেই খালি মাথায় নামায পড়ার এ প্রথা বেড়ে চলছে। বরং অজ্ঞ মুর্খরা তো খালি মাথায় নামায পড়াকে সুন্নত মনে করছে। (আল্লাহর পানা)
তিনি আরো বলেন- কাপড় থাকা সত্ত্বেও খালি মাথায় নামায আদায় করা- হয় জিদের কারণে হবে, নতুবা কম আকলের কারণে।
(ফাতওয়ায়ে ওলামায়ে হাদীস- খ:৪ পৃ:২৮৬/২৮৯)

৫. শায়খুল হাদীস মাওলানা আবু সাঈদ শরফুদ্দীন সাহেব বলেন- আল্লাহর হুকুম خذوا زينتكم عند كل مسجد (প্রত্যেক নামাযের সময় পোষাক পরিধান কর) এবং রাসূল সা. এর পাগড়ী বেঁধে নামায আদায় করার আমল অনুযায়ী পাগড়ী বেঁধে নামায আদায় করা সুন্নত। খালি মাথায় নামায আদায়কে অভ্যাসে পরিণত করা বান্দার আবিস্কৃত (বিদআত) এবং সুন্নত পরিপন্থী।
(ফাতওয়ায়ে ছানাইয়্যা- খ: ১ পৃ:২৯২)

৬. আহলে হাদীসের ইমাম ও মুফতী মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব বলেন- টুপি কিংবা পাগড়ী পরে নামায আদায় করা উত্তম। কেননা টুপি ও পাগড়ী সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। (ফাতওয়ায়ে সাত্তারিয়্যা- খ:৩ পৃ:৫৯)

৭. মাওলানা আব্দুল মজীদ সুহদারবী সাহেব বলেন-খালি মাথায় নামায পড়লে নামায হয়ে যায়। তবে বেপরওয়া ফ্যাশনপ্রিয়তা এবং আতি ফেরকাপ্রিয়তার কারণে অভ্যাস করে নেয়া, যেমনটা আজকাল করা হচ্ছে, আমাদের নিকট সহীহ নয়। এমন আমল রাসূল সা. করেন নি। (ফাতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস- ৪/২৮১)

৮. আহলে হাদীসের শায়খুল আরব ওয়াল আজম মাওলানা সায়্যেদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী সাহেব বলেন-

"মাথা ঢেকে নামায আদায় করাকে একটি পছন্দনীয় আমল সাব্যস্ত করার কোন অবকাশ নেই।"

এহেন মন্তব্যের সাথে অধমের মতপার্থক্য রয়েছে। হাদীস গ্রন্থাদি ঘেটে ঘুটে জানা যায় যে, অধিকাংশ সময় রাসূল সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম, মাথায় হয় পাগড়ী বেঁধে রাখতেন, নতুবা টুপি পরে থাকতেন। অধমের দৃষ্টিতে এমন কোন সহীহ হাদীস অতিবাহিত হয়নি, যা থেকে জানা যায় যে, রাসুল সা. হজ্জ ও ওমরা ব্যতীত কখনো খালি মাথায় চলা ফেরা করেছেন। এমনও অতিবাহিত হয়নি যে, রাসূল সা. এর মাথায় আগে থেকে পাগড়ী বা টুপি ছিল কিন্তু মসজিদে এসে খুলে রেখে দিয়েছেন। এরপর খালি মাথায় নামায শুরু করেছেন।

আমরা বড় বড় উলামা ও ফুজালা দেখেছি, যারা অধিকাংশ সময় মাথা ঢেকে চলা-ফেরা করেন এবং মাথা ঢেকেই নামায আদায় করেন। খালি মাথায় চলা-ফেরা, নামায আদায় , নতুন প্রজন্ম, বিশেষতঃ জামায়াতে আহলে হাদীসের লোকেরা যেটাকে অভ্যাসে পরিণত করেছে, এটাকে প্রচলিত ফ্যাশনের অনুসরণ তো বলা যায়। কিন্তু সুন্নতের অনুসরণ বলার কোন সুযোগ নেই।

(আল ইতিসাম, লাহোর, খন্ডঃ ৪৫, সংখ্যা ২৭ ও ৩০ জুলাই- ১৯৯৩)

৯. আহলে হাদীসের প্রসিদ্ধ আলেম ইসলামী ইতিহাসবেত্তা মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক বাহটী সাহেব বলেন- প্রখ্যাত হাদীস বিশারদগণ খালি মাথায় নামায আদায়কে অপছন্দ করেন। কিন্তু নতুন প্রজন্মের আহলে হাদীস ওলামা খালি মাথায় নামায আদায়ের পক্ষে দলীল পেশ করার চেষ্টা করে থাকে। (মাসিক আর রশীদ, লাহোর)

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কারঃ

আহলে হাদীস বন্ধুদের প্রতি আহ্বান হল- তারা যদি-

১. সহীহ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণ করতে পারে যে, রাসূল সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম পুরো জীবনে পর্যাপ্ত কাপড়ের উপস্থিতি এবং কোন ওযরের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মসজিদে ফরয নামায খালি মাথায় আদায় করেছেন।

এবং

২. উক্ত হাদীসকে উম্মতের কারো মত বা উক্তির তাকলীদ ব্যতীত সহীহ প্রমাণ করতে পারে,

তাহলে তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরুস্কার দেয়া হবে। বন্ধু! চেষ্টা করে দেখো।

তৃতীয় মাসআলাঃ- নামাযে পা ছড়িয়ে দাঁড়ানো

প্রশ্নঃ নামাযে উভয় পায়ের মাঝে কতটুকু ব্যবধান হবে?

উত্তরঃ ইমাম, মুক্তাদী কিংবা একাকী নামায আদায়কারী, প্রত্যেকেই নিজ নিজ শরীরের গঠন অনুযায়ী ব্যবধান রেখে এমনভাবে দাঁড়াবে, যেন আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী হয়ে থাকে এবং দাঁড়ানো, রুকু ও সিজদা, এ তিনও অবস্থায় একই দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়। সিজদার অবস্থায় ব্যবধান বৃদ্ধি করার কিংবা সংকোচনের প্রয়োজন যেন না হয়। তবে জামায়াতের জন্য কাতারবন্ধী হওয়ার সময় দু'টি বিষয়ে খেয়াল রাখার প্রতি হাদীসে অত্যন্ত তাকীদ এসেছে।

১. মুসল্লীগণ নামাযে পা, হাটু, কাঁধ এবং গর্দান এমনভাবে সোজা করে দাঁড়াবে, যেন কাতার সম্পূর্ণ সোজা হয়ে যায়। কোন মুসল্লী যেন কাতারের সামনে-পিছে না হয়। অন্যথা কাতার বাঁকা হয়ে যাবে।

২. মুসল্লীবৃন্দ এমন ভাবে লেগে লেগে দাঁড়াবে যেন পরস্পরের মাঝে ফাঁকা না থাকে।

নামাযের কাতার সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস:

১. **قال سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا و الله لتقيمن صفوفكم أو يخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجال يلزق منكبه بمنكب صاحبه و ركبته بركبة صاحبه و كعبه بكعبه -**

নু'মান ইবনে বাশীর রা. বলেন- একদা রাসূল সা. আমাদের দিকে মুখ করে তিন বার বললেন- কাতার সোজা করে নাও। আল্লাহর কসম, তোমরা নামাযের কাতার সম্পূর্ণ সোজা করে নিবে। অন্যথা আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।
নু'মান ইবনে বাশীর রা. বলেন- আমি দেখলাম রাসূল সা. এর এ নির্দেশ শুনে প্রত্যেকেই পার্শ্ববর্তী জনের কাঁধের সাথে কাধ, হাটুর সাথে হাটু এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিচ্ছে। (আবু দাউদ শরীফ- ১/৯৭)

২. **عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف و حاذوا بين المناكب و سدو الخلل و لينوا بأيدى إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان -**

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত- রাসূল সা. বলেন- কাতার সোজা কর। কাঁধ- বরাবর কর। খালি জায়গা পুরা কর। মুসলমান ভাইয়ের হাতে নরম হও। শয়তানের জন্য খালি জায়গা রেখনা।
(আবু দাউদ শরীফ- ১/৯৭)

৩. **عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: رصوا صفوفكم و قاربوا بينها و حاذوا بالأعناق-**

আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত- রাসূল সা. বলেছেন- কাতারে লেগে লেগে দাঁড়াও। গর্দান- বরাবর কর।
(আবু দাউদ শরীফ- ১/৯৭)

হাদীসগুলো থেকে যা জানা গেল :

১. আসল উদ্দেশ্য হল- কাতার সোজা হওয়া এবং কাতারের মাঝে খালি জায়গা না থাকা।

২. টাখনু থেকে উদ্দেশ্য হল পা। অর্থাৎ পা পায়ের সাথে লাগানো। কেননা টাখনুকে টাখনুর সাথে মিলানো তখনই সম্ভব, যদি উভয় পা বাঁকা করে স্থাপন করা হয়। কিন্তু নামাযে এভাবে দাঁড়ানো কষ্টকর।

৩. পা-পায়ের সাথে মিলানোর অর্থ হল- মিলে মিলে দাঁড়ানো। পা কাছা কাছি স্থাপন করা। সরাসরি পায়ের সাথে পা মিলানো উদ্দ্যেশ্য নয়। কেননা নোমান ইবনে বাশীরের রা. এর হাদীসে তিন অঙ্গ মিলানোর কথা বলা হয়েছে। টাখনু, হাটু, কাঁধ।
এখন হাটুকে হাটুর সাথে মিলানো কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। আর টাখনু মিলানোর জন্য পা চওড়া করা হলে, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলবেনা। আবার পায়ের সাথে পা এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ালেও নামায আদায় কষ্টকর হয়ে যাবে। নামাযীদের মাঝে ধাক্কা ধাক্কি লেগে যাবে। এজন্য নামাযে পা, পায়ের সাথে লাগানোর চেষ্টা অযথা নামায বরবাদ করার নামান্তর।
হাদীসে (إلزاق) মিলানোর নির্দেশ এসেছে বিধায়, পা পায়ের সাথে মিলানো ব্যতীত যারা তৃপ্তই হতে পারছেন না। তাদেরকে বলা হবে হাদীসে (كعب) টাখনু শব্দ এসেছে। সুতরাং দু'দিকেই টাখনু মিলিয়ে দাঁড়ান। হাদীসে (ركبة) হাঁটু শব্দ এসেছে। হাঁটুও মিলেয়ে দাঁড়ান। হাদীসে (منكب) কাঁধ মিলানোর জন্য বলা হয়েছে। তাই কাঁধও মিলিয়ে দাড়ান।
কিন্তু এ সবগুলোকে মিলিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। এজন্য আহলে হাদীস বন্ধুদের উচিৎ- কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সাথে কনিষ্ঠা আঙ্গুল এবং পায়ের সাথে পা মিলানোর অযথা মেহনত থেকে বিরত থাকা। কেননা উল্লিখিত হাদীস ও আলোচনার আলোকে একথা স্পষ্ট যে, শরীয়তের নির্দেশ হল লেগে লেগে দাঁড়ানো। মাঝখানে ফাকা না রাখা।

৪. এ বিষয়টিও প্রণিধান যোগ্য যে, দু'পায়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান সর্ম্পকে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কোন পরিমাণ নেই। মুসল্লী, তার শারীরিক গঠন হিসাবে এমনভাবে দাঁড়াবে, যেন-কোন সংকীর্ণতা বা কষ্টকর

পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়। যেন নামাযের একাগ্রতা কোন ক্রমেই নষ্ট না হয়। আবার যেন দু'জনের কাঁধের মাঝে ফাঁকাও না থাকে। তবে পর্যবেক্ষণ এ সিদ্ধান্তই প্রদান করে যে, একজন স্বাভাবিক গঠণের অধিকারী ব্যক্তির জন্য চার থেকে ছয় আঙ্গুল ব্যবধানই যথেষ্ট।

বন্ধু! আপন নামায ক্রটিমুক্ত করুন

আহলে হাদীস বন্ধুরা ইদানিং পা- যে পরিমাণ ছড়িয়ে দাঁড়ায় এর দ্বারা নামাযে কয়েকটি ক্রুটি সৃষ্টি হয়। যথা-

১. উভয় পায়ের মাঝখানে এত অধিক পরিমাণ ফাঁকা রাখলে, সিজদা এবং সিজদা পরবর্তী বৈঠক মুশকিল হয়ে পড়ে। এজন্য তারা সিজদার সময় সংকোচন করে। আবার দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে দেয়। যা নামাযের একাগ্রতা পরিপন্থী
২. কাঁধ থেকে কাঁধের দূরত্ব বেড়ে যায়। যা হাদীস পরিপন্থী।
৩. আহলে হাদীস দু'জন মুসল্লী যে পরিমাণ জায়গা নিয়ে কাতার বন্দী হয়, তারা আহলে সুন্নতের নিয়মে দাঁড়ালে মাঝখানে আরেকজন মুসল্লী দাঁড়ানোর জায়গা ফাঁকা থেকে যাবে। এ হিসাবে ৫০ জন আহলে হাদীস মুসল্লীর মাঝে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসল্লীর জায়গা ফাঁকা বের হবে। যা তারা পা ছড়িয়ে পূর্ণ করে । অথচ তা পা ছড়িয়ে নয় বরং মুসল্লী দাঁড়িয়ে পূর্ণ করাই হাদীসের নির্দেশ।
   আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সা. বলেন- তোমাদের মধ্যে সে নামাযী উত্তম, যিনি কাঁধের দিক থেকে নরম। অর্থাৎ দু' নামাযীর মাঝে খালি জায়গা থাকা অবস্থায় তৃতীয় নামাযী এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে বাঁধা দেয়না। আবার কাতারবন্দী হওয়ার সময় মধ্যকার ফাঁকা জায়গা পূরণ করে দাঁড়াতে বললে, সে পূরণ করে দাঁড়ায়। কোনো হাদীসে একথা নেই যে, দু'জনের মাঝে ফাঁকা থাকলে পা দ্বারা পূরণ কর। অথচ এ হাদীস বিরোধী কাজটিই আহলে হাদীস বন্ধুরা করে থাকে।
৪. হাদীসে পা হাটু এবং কাঁধ লাগানোর জন্য বলা হয়েছে। আহলে হাদীস তো পা খুব লাগিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হাটু এবং কাঁধের মাঝে শুধু দূরত্বই সৃষ্টি করেনা। বরং পা ছড়িয়ে তা আরো বাড়িয়ে নেয়। আবার বলে- তারাই নাকি আহলে হাদীস। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন।

আহলে হাদীস ওলামার ফতওয়া:

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একদল আহলে হাদীস শুধু হানাফীদের বিরোধিতার জন্য নামাযে পা ছড়ানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। অথচ আহলে হাদীস আলেমগণও তাদেরকে এহেন কাজ থেকে বারণ করেছেন। দেখুন..

১. মাওলানা আব্দুল্লাহ রওপড়ী সাহেব বলেন- কিছু লোক পা অত্যধিক ছড়িয়ে দাঁড়ায়। ফলে কাঁধ কাঁধের সাথে মিলিত হয়না। তাদের এ কাজটি ভুল। কেননা যে হাদীসে পা মিলানোর কথা এসেছে, সে হাদীসে কাঁধ মিলাতেও বলা হয়েছে। (ফাতওয়ায়ে ওলামায়ে হাদীস- ৩/২১)
২. যে সব আহলে হাদীস দাঁড়ানো অবস্থায় পা মিলায়। আবার সিজদার অবস্থায় সরিয়ে নেয়। তাদের উদ্দেশ্যে মাওলানা রওপড়ী সাহেব বলেন- জাহেলদের অভ্যাস হল- সিজদা অবস্থায় পা সরিয়ে নেয়। উঠে আবার মিলিয়ে নেয়। এরকম সরানো আর মিলানো সমীচীন নয়। কেননা নামাযে অযথা পা এদিক সেদিক করা জায়েয নেই। বরং নামাযে পা এক জায়গায় রাখার চেষ্টা করা উচিৎ। যাতে নামাযে অনর্থক নড়াচড়া না হয়। (ফাতওয়ায়ে ওলামায়ে হাদীস- ৩/১৯৯)

তৃতীয় চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুদের প্রতি আহবান হল-

(ক) তারা তাদের দাবী রক্ষার্থে কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তাবীল ব্যতীত নুমান ইবনে বাশীর রা. এর হাদীস অনুযায়ী টাখনুর সাথে টাখনু, হাটুর সাথে হাটু, এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে নামায শুরু করুক।

(খ) তাদের বর্তমান আমল (পা- পায়ের সাথে মিলানো আর টাখনু- টাখনু থেকে, হাটু-হাটু থেকে এবং কাঁধ- কাঁধ থেকে দুরে রাখা) রাসূল সা. এর কোন কওলী (উক্তিমূলক) বা ফে'লী (কর্মমূলক) হাদীসে সহীহ, সরীহ, মারফু, মুত্তাসিল দ্বারা প্রমাণ করুক।

(গ) উক্ত হাদীসের মান (সিহ্যত) উম্মতের কারো মত ও উক্তির তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করুক।

যদি তারা প্রমাণ করতে সক্ষম হয় আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

চতুর্থ মাসআলা: কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন

প্রশ্ন: আহলে সুন্নত নামায শুরু করতে কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন করে।

উত্তর: নামায শুরু করতে হাত কী পরিমাণ উত্তোলন করা হবে এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের রেওয়ায়েত রয়েছে।

১. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه-

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত- রাসূল সা. যখন নামায শুরু করতেন, কাঁধ পর্যন্ত হাত উত্তোলন করতেন। (সুনানে নাসায়ী- ১/১৪০)

২. عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما افتتح الصلاة كبرو رفع يديه حتى حاذتا أذنيه

অয়েল ইবনে হুজর রা. বলেন- আমি রাসূল সা. এর পিছনে নামায পড়েছি। যখন তিনি নামায শুরু করতেন, এমন ভাবে হাত উত্তোলন করতেন যে, উভয় হাত কান বরাবর হয়ে যেত। (সুন্নানে নাসায়ী- ১/১৪০)

৩. عن مالك بن الحويريث------ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه

মালেক ইবনে হুওয়াইরিছ রা. বলেন- রাসূল সা. নামাযের তাকবীর বলার সময় কান বরাবর হাত উত্তোলন করতেন।

(সুনানে নাসায়ী- ১/১৪০)

৪. عن مالك بن الحويريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل فى الصلاة رفع يديه حتى حاذتا فروع أذنيه-

মালেক ইবনে হুওয়াইরিছ রা. বলেন- রাসূল সা. কে দেখেছি, তিনি যখন নামাযে দাখেল হতেন, হাত উত্তোলন করতেন। এমনভাবে যে, কানের কিনারা বরাবর হয়ে যেত।

(সুনানে নাসায়ী- ১/১৪০ ও সহীহ মুসলিম- ১/১৬৮)

৫. عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبها ماه تحاذى شحمة أذنيه-

অয়েল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সা. কে দেখেছেন যখন নামায শুরু করতেন, উভয় হাত এত উত্তোলন করতেন যে প্রায় কানের লতি বরাবর হয়ে যেত। (সুনানে নাসায়ী- ১/১৪১)

৬. عن وائل بن حجر قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم فى افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية-

অয়েল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূল সা. কে দেখেছি- তিনি নামায শুরু করার সময় কান বরাবর হাত উত্তোলন করতেন। এরপর তাদের নিকট আসলাম। দেখলাম- তারা নামায শুরু করার সময় সীনা পর্যন্ত হাত উত্তোলন করে। তখন তাদের মাথায় টুপি এবং শরীরে চাদর ছিল। (আবু দাউদ- ১/১০৫)

হাদীসগুলোর মাঝে সমন্বয়:

ইমাম আবু হানিফা রহ. আল্লাহ প্রদত্ত ফাকাহাত এবং ইজতিহাদ বলে হাদীসগুলোর মাঝে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, মুসল্লী নামায শুরু করার সময় হাত এমনভাবে উত্তোলন করবে যে, হাতের তালু কাঁধ বরাবর, বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর, আঙ্গুলসমূহ কানের উপরের কিনারা সমান হয়ে যাবে। যাতে একই সাথে সব হাদীস অনুযায়ী আমল হয়ে যায়। তবে সীনা পর্যন্ত হাত উঠানো ওযর ও অপারগ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। 'তাদের মাথায় টুপি এবং শরীরে চাদর ছিল' হাদীসের শেষাংশের এ বাক্যটি এ ব্যাখ্যার ইঙ্গিত বহন করে। বুঝা যায় যে, তখন শীতকাল ছিল। এ ওযরের কারণে তারা চাদরের ভিতরেই সীনা পর্যন্ত হাত উত্তোলন করেছিলেন।

চতুর্থ চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুরা যদি নামাযের শুরুতে হাত উত্তোলন সম্পর্কিত হাদীসগুলো সম্পর্কে রাসূল সা. এর সহীহ, সরীহ, মারফু, মুত্তাসিল হাদীস থেকে এ ফায়সালা দেখাতে পারেন যে,

১. রাসূল সা. কাঁধ পর্যন্ত হাত উত্তোলনের হুকুম করেছেন এবং কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন থেকে বারণ করেছেন।

অথবা ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, তোমরা স্বাধীন। যেমন মনে চায় কর। অথবা রাসূল সা. এ ফয়সালা করেছেন যে, কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানোর হাদীসগুলো রাজেহ বা অধিক গ্রহণীয়।

এবং

২. উক্ত হাদীসের মান (সিহ্যত) উম্মতের কারো মত ও উক্তির তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে পারে-

আমরা তাদেরকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

পঞ্চম মাসআলা: নাভির নিচে হাত বাঁধা

প্রশ্ন:- নাভির নিচে হাত বাঁধার কি কোন দলীল আছে?

উত্তর:- নাভির নিচে হাত বাঁধা রাসূল সা. সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবয়ে তাবেয়ীনের আমল দ্বারা প্রমাণিত। দেখুন-

১. **عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله فى الصلاة تحت السرة**

অয়েল ইবনে হুজর থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন- আমি রাসূল সা. কে দেখেছি যে, তিনি নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর স্থাপন করে নাভির নিচে রেখেছেন। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা- ১/৩৯০)

২. **عن على رضى الله تعالى عنه من سنة الصلاة وضع الأيد ى تحت السرر**

আলী রা. বলেন- নামাযের সুন্নত হল নাভির নিচে হাত বাঁধা।
(মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা- ১/৩৯১ও মুসনাদে আহমদ- ১/১১০)

৩. **الحجاج بن حسان قال: سمعت ابا مجلز أو سالته قال: قلت كيف يصنع قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله و يجعلها أسفل من السرة-**

আবু মিজলায রহ. মুসল্লীর হাত বাঁধার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন- ডান হাতের পেট বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে এবং নাভির নিচে স্থাপন করবে। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩৯১, আছারুস সুন্নান-৭১, আছারুস সুন্নান প্রণেতা বলেন- সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ)

৪. ইব্রাহীম নখয়ী রহ. বলেন- মুছল্লী ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে স্থাপন করবে। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা- ১/৩৯০ এবং আছারুস সুনেই ৭১- হাদীসটির সনদ হাসান পর্যায়ের)

৫. **عن أبي هريرة قال: وضع الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة**

আবু হুরায়রা রা. বলেন- নামাযে হাত হাতের উপর এবং নাভির নিচে রাখা হবে।
(আল জাওহারুন নকী আলাল বায়হাকী -২/৩১ মুহাল্লা ইবনে হজম-২/১)

৬. **عن أنس رضى الله تعالى عنه قال ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار و تأخير السحور و وضع اليد اليمنى على اليسرى فى الصلاة تحت السرة-**

আনাস রা. থেকে বর্ণিত-তিনি বলেন- তিনটি বিষয় নবুয়তের অন্যতম চরিত্র। তাড়াতাড়ি ইফতার করা, বিলম্বে সাহরী খাওয়া এবং নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে স্থাপন করা। (আল জাওহারুন নকী আলাল বায়হাকী- ২/৩২, মুহল্লা ইবনে হজম ৩/৩০)

৭. **عن أمير المؤمنين على قال: إن من السنة فى الصلاة وضع اليمين على الشمال تحت السرة-**

আমিরুল মু'মিনীন আলী রা. বলেন- নামাযে সুন্নত হল- ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে স্থাপন করা।
(দারাকুতনী ও বায়হাকী এবং মুসনাদে আহলে বায়ত- ১৭৪)

স্মর্তব্য যে, মুসনাদে আহলে বায়ত হল- আহলে হাদীসের কিতাব। কিতাবপ্রণেতা মুহাম্মদ ইবনে আল- বাকেরী- দু'জনের মধ্যস্থতায় মিঞা নযীর হুসাইন সাহেবের ছাত্র ও শিষ্য। এ তথ্য উক্ত মুসনাদের ৮নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

আহলে হাদীসের অশালীন মন্তব্য :

মানুষ সত্যবিমুখ হলে সে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাও হারিয়ে ফেলে। তাই বলে আহলে হাদীস নাম দিয়ে হাদীস কটাক্ষ করা? এটাও সম্ভব? আহলে সুন্নতকে লক্ষ্য করে আহলে হাদীস আলেম মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ ফরিদকুটী সাহেব এমন তীর ছুড়েছেন যা নবীর হাদীসকেও ক্ষত-বিক্ষত করেছে। নাভির নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কে এতগুলো হাদীস থাকা সত্ত্বেও তিনি বলেন-

আপনি এবং আপনার মুক্তাদীরা একেবারে লিঙ্গ বরাবরই হাত বাঁধেন। যা দ্বারা অযু ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। (কওলে হক-৪১)

পঞ্চম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুরা ডান হাত বাম হাতের কনুই বরাবর রেখে সীনার উপরে স্থাপন করে। তাদের প্রতি আহ্বান হল-

১. যদি তারা এ আমলের পক্ষে সিহাহ সিত্তাহ থেকে কোন হাদীসে সহীহ, সরীহ, মারফু, মুত্তাসিল পেশ করতে পারে।
এবং
২. উক্ত হাদীসের সিহ্যত এবং আমাদের হাদীসের যুয়ফ উম্মতের কারো মত ও উক্তির তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে পারে।

আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব।

ভুয়া হাওয়ালা:

আহলে হাদীসের শায়খুল ইসলাম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসারী ফাতওয়ায়ে ছানাইয়্যার ১/৪৪৩ এ লিখেছেন যে, সীনার উপর হাত বাঁধার পক্ষে বুখারী-মুসলিমে অনেক হাদীস রয়েছে।

ফাতওয়ায়ে ছানাইয়্যার প্রথম খন্ডের ৪৫৭ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন- নবী করীম সা. সীনার উপর হাত বাঁধতেন। বুখারী শরীফেও এ মর্মে একটি হাদীস রয়েছে।

এবং 'মুজাহিদীনে লস্করে তায়্যেবা' এর নিসাবী পুস্তক 'রিয়াজুল মুজাহিদীনে' ৯০নং পৃষ্ঠায় সীনার উপর হাত বাঁধা নামে একটি শিরোনাম দিয়েছেন। এরপর প্রমাণ করার জন্য বুখারী শরীফ বাব নং- ৪৭৭, পৃষ্ঠা নং-৩৭১ ও খন্ড নং- ১ এর হাওয়ালা দিয়েছেন। সাথে সাথে সুনানে নাসায়ীরও হাওয়ালা দিয়েছেন।

ষষ্ঠ চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

বন্ধুদের প্রতি আহ্বান হল- যদি তারা

১. উক্ত হাদীস আরবী মতন ও সনদসহ বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী শরীফে দেখাতে পারেন
এবং
২. উক্ত হাদীসের সিহ্যত উম্মের কারো মত ও উক্তির তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে পারেন

আমরা এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

ষষ্ঠ মাসআলা: ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহাপড়া

প্রশ্ন: আহলে সুন্নতের লোকেরা ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ে না। এর কী কোন দলীল আছে?

জওয়াব: অনেক দলীল আছে। তবে তা উল্লেখ করার পূর্বে দু'টি প্রশ্নের সমাধান হওয়া আবশ্যক। যথা-

১. সূরা ফাতিহা কিরাআতের অন্তর্ভূক্ত কিনা?
২. আহলে সুন্নত এবং আহলে হাদীসের মাঝে বির্তকের উৎস কী?

প্রথম প্রশ্নের সমাধান:

একাধিক দলীলের আলোকে সূরা ফাতিহা কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত। যথা-

১. **قال: حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير و القراءة- إسكاته قال حسبه هنية فقلت: بأبى أنت و أمى يا رسول الله! إسكاتك بين التكبير و القراءه ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بينى و بين خطاياى كما باعدت بين المشرق و المغرب، اللهم نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياى بالماء و الثلج و البرد-**

আবু হুরায়রা রা. বলেন- রাসূল সা. তাকবীর ও কিরাআতের মাঝে কী যেন আস্তে আস্তে পড়তেন। আমি বললাম ইয়া রাসূল্লাহ! আমার আব্বা-আম্মা আপনার উপর কোরবান হোক। আপনি তাকবীর ও কিরাআতের মাঝে আস্তে আস্তে কী পড়েন? রাসূল সা. বললেন আমি **اللهم باعد بينى الخ** দু'আটি পড়ি। (বুখারী শরীফ- ১/১০৩)

একথা সর্বজন স্বীকৃত এমন কী আহলে হাদীসের নিকটও যে, এ দু'আটি তাকবীরে তাহরিমা এবং সূরায়ে ফাতিহার মাঝে পড়ার নিয়ম। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীসে সূরা ফাতিহাকেও কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এরপরও আহলে হাদীস বলবে- সূরা ফাতিহা কিরাআত নয়। বরং কিরাআত হল সূরা

ফাতিহার পরবর্তী সূরা। আমরা বলব আহলে হাদীসের উচিৎ- সূরা ফাতিহা শেষ করে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। এরপর উক্ত দু'আ পড়ে সাথে সূরা মিলাবে। যাতে উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল হয়ে যায় এবং তাদের দাবীও রক্ষা পায়।

২. ইমাম বুখারী রহ. - باب وجوب القراءة للإمام و المأموم (অর্থাৎ ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য কিরাআত ওয়াজিব হওয়ার পরিচ্ছেদ) শিরোনামের অধীনে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। لا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহার কিরাআত পড়ল না, তার নামায হয়নি।

ইমাম বুখারী রহ. এর শিরোনামে এবং এ হাদীসের শব্দ থেকেও বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর রহ. নিকট সূরায়ে ফাতিহা কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত।

৩. عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كان النبى صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر يستفتحون القرائة بفاتحة الكتاب-

আনাস রা. বলেন- রাসূল সা., আবু বকর ও ওমর রা. সূরায়ে ফাতিহা দিয়ে কিরাআত শুরু করতেন।

(নাসায়ী শরীফ-১/১৪৩, বুখারী শরীফ- ১/১০৪)

৪. عن عائشة رضى الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير و القرائة بالحمد لله رب العالمين- الخ

আয়শা রা. বলেন- রাসূল সা. তাকরীরে তাহরীমা দিয়ে নামায এবং সূরায়ে ফাতিহা দিয়ে কিরাআত শুরু করতেন।

(মুসলিম শরীফ- ১/১৯৪)

৫. ইমাম নাসায়ী রহ. প্রথম খন্ডের ১৪২/১৪৩ নং পৃষ্ঠায় باب الدعاء بين التكبير و القرائة নামে চারটি শিরোনাম বেঁধেছেন। যাতে কিরাআত বলতে সূরায়ে ফাতেহাকে বুঝিয়েছেন। কেননা দু'আ সূরায়ে ফাতিহা এবং তাকবীরে তাহরিমার মাঝে পড়া হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম নাসায়ীর নিকটও সূরা ফাতিহা কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা:

উক্ত আলোচনার থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, সূরা ফাতিহাও কিরাআতের অর্ন্তভুক্ত। বরং মুক্তাদীর উপর কিরাআত ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার যে মতভেদ রয়েছে, সেখানে সূরা ফাতিহাই উদ্দেশ্য। সুতরাং সামনে যেখানে কিরাআত শব্দ আসবে, সেখানেও সূরা ফাতিহাই উদ্দেশ্য হবে এবং কিরাআতের জন্য যে হুকুম সাব্যস্ত হবে, তা সূরায়ে ফাতেহার জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এ কথাটি স্পষ্ট করার জন্যই বর্ণিত আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

সপ্তম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুরা যদি-

১. শুধুমাত্র একটি হাদীসে সহীহ, সরীহ, মুত্তাসিল, মারফু পেশ করতে পারেন, যাতে স্পষ্ট এ কথা বলা হয়েছে যে, সূরায় ফাতিহা কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত নয়

এবং

২. উক্ত হাদীসের সিহ্যত এবং আমাদের হাদীসের যুয়ফ উম্মতের কারো মত ও উক্তির তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে পারে,

আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান : বির্তকের উৎস নির্ণয়

আহলে হাদীসের দাবী হল- রাসূল সা. এর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম রা. তাঁর পিছনে কিরাআত পড়তেন। সুতরাং এ যমানায়ও ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই যার যার কিরাআত পড়বে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দাবী হল- সাহাবায়ে কেরাম শুরু যমানায় রাসূল সা. এর পিছনে কিরাআত পড়তেন। তবে এ হুকুম শেষ সময় পর্যন্ত বলবৎ ছিলনা। বরং পরবর্তীতে ইমামের কিরাআত ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত করে মুক্তাদীকে কিরাআত থেকে বারণ করা হয়েছে। এ হল মূল বির্তক। তবে এ দাবীর পক্ষে আমাদের নিকট পাঁচ প্রকার দলীল রয়েছে।

আমাদের দলীলসমূহ:

প্রথম প্রকার: ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর কিরাআত

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন- যোহর অথবা আসরের নামাযে এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর পিছনে কিরাআত পড়ছিল। এ অবস্থা দেখে আরেকজন নামাযের মাঝামাঝি পর্যায়ে তাঁকে ইশারায় বাঁধা দিল। নামায শেষ হওয়ার পর প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে প্রশ্ন করল- তুমি রাসূল সা. এর পিছনে কিরাআত পড়া থেকে আমাকে নিষেধ করলে কেন? তাদের তর্ক শুনে রাসূল সা. বললেন- যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়ে তার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট।

(কিতাবুল কিরাআত, বায়হাকী শরীফ পৃ: ১২৬)

২. **عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:**

من صلى خلف الإمام فإن قرائة الإمام له قرائة -

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন- যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায আদায় করে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। (মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ পৃ: ৯৮)

৩. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেন- যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায আদায় করে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা- ১/৩৭৭)

৪. জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন- যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায আদায় করে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। (মুসনাদে আহমদ- ৩/৩৩৯ ও ফাতহুল কদীর, ১/২৯৫)

৫. জারেব ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন- যে ব্যক্তি ইমামের ইক্তিদা করল ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। (কিতাবুল কিরাআহ, রায়হাকী শরীফ- ১৩৮)

৬. **عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصر قال: فقرء رجل خلفه فغمزه الذي يليه فلما أن صلى قال: لم غمزتنى ؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدامك فكرهت أن تقرء خلفه ائته له قرائة - فسمعه النبى صلى الله على وسلم فقال من كان له إمام فقر**

আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রা. বলেন- একদিন রাসূল সা. আছরের নামাযে ইমামতি করেছেন। এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর পিছনে কিরাআত পড়ল। পাশের ব্যক্তি তার শরীরে সামান্য চাপ দিল যাতে সে কিরাআত পড়া থেকে বিরত থাকে। নামায শেষ হলে প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল তুমি আমার শরীরে চাপ দিলে কেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তরে বলল- রাসূল সা. কিরাআত পড়ছিলেন। তাই আমি সমীচীন মনে করলাম না যে, তুমিও কিরাআত পড়। উভয়ের কথা-বার্তা শুনে রাসূল সা. ইরশাদ করলেন- যে ব্যক্তি ইমামের ইক্তিদা করল, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। (মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ- ১০১)

৭. আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করা হল- সব নামাযেই কি কিরাআত পড়তে হয়? রাসূল সা. বললেন- হ্যাঁ, পড়তে হয়। একজন আনসারী সাহবী রা. বললেন- তাহলে তো কিরাআত জরুরী হয়ে গেল। আবু দারদা রা. বলেন মজলিশের সকলের তুলনায় আমি রাসূল সা. এর বেশী নিকটে ছিলাম। রাসূল সা. আমাকে সম্বোধন করেই বলেছিলেন। আমি এমনটাই মরে করি যে, ইমামের কিরাআত মুক্তাদীদের জন্য যথেষ্ঠ। (দারাকুতনী- ১/৩৩২)

৮. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন- যে ব্যক্তি ইমামের ইক্তেদা করবে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। (কিতাবুল কিরাআত- ১৭০)

৯. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেন- যার ইমাম থাকবে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।

(কিতাবুল কিরাআত, বায়হাকী- ১৫১)

১০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেন তোমার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ঠ। চাই সে আস্তে কিরাআত পড়ুক কিংবা উচ্চস্বরে। (দারাকুতনী- ১/১৩১)

১১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. একদা সাহাবায়ে কেরাম রা. কে নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে সাহাবায়ে কেরামের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন- ইমাম কিরাআত পড়ার সময় তোমারাও

কিরাআত পড় নাকি? সাহাবায়ে কেরাম রা. চুপ থাকলেন। রাসূল সা. এ প্রশ্ন তিনবার করলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন জী, আমরা এমন করি। রাসূল সা. বললেন- এমন করোনা। (কিতাবুল কিরাআত, বায়হাকী- ১৫৩)

১২. নওয়াস ইবনে সাময়ান রা. বলেন- আমি রাসূল সা. এর পিছনে যোহরের নামায আদায় করলাম। আমার ডান পাশে একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনি রাসূল সা. এর পিছনে কিরাআত পড়লেন। আর আমার বাম পাশে মুযাইনাহ গোত্রের একজন ছিলেন। যিনি কংকর নিয়ে খেলছিলেন। নামায শেষ করে রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন- আমার পিছনে কে কিরাআত পড়েছে। তখন আনাসারী সাহাবী বলল- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি পড়েছি। রাসূল সা. বললেন এমন করোনা। কেননা যে ইমামের ইক্তেদা করে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। যিনি কংকর নিয়ে খেলছিলেন তাকে লক্ষ করে বললেন- তোমার জন্য নামাযের এ অংশটুকুই।
(কিতাবুল কিরাআত- ১৭৬)

১৩. ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ এবং ইয়াযীদ ইবনে আবু ইয়াজ থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন–তোমাদের মধ্য থেকে যার জন্য ইমাম থাকবে এবং সে যদি ঐ ইমামের ইক্তেদা করে, তাহলে যেন ইমামের সাথে কিরাআত না পড়ে। কেননা ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। (কিতাবুল কিরাআত বায়হাকী ১৮৩)

অষ্টম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুদের প্রতি আহবান হল-

১. যদি তারা শুধুমাত্র এমন একটি হাদীসে সহীহ, সরীহ, মারফু, মুত্তাসিল পেশ করতে পারে, যাতে বলা হয়েছে যে ইমামের কিরাআত মুক্তদীর কিরাআত নয়
এবং
২. উক্ত হাদীসের সিহ্যত এবং আমাদের হাদীসের যুয়ফ উম্মতের কারো মতও উক্তির তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে পারে

আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

দ্বিতীয় প্রকার: ইমাম কিরাআত পড়ার সময় মুক্তাদী চুপ থাকবে

১. আল্লাহ তায়ালা বলেন–**وإذا قرءالقران فاستمعواله وأنصتوا لعلكم ترحمون** যখন কোরআন পড়া হবে,তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে কান লাগিয়ে শুন এবং একদম চুপ থাক যাতে তোমাদের উপর মেহেরবানী করা হয়। (সূরা–আরাফ-আয়াত-২০৪)

এ আয়াতের উপর ইমাম নাসায়ী রহ. শিরোনাম দিয়েছেন **تأويل قوله عز و جل وإذا قرء القران الخ** অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বাণী **و اذا اقرء الخ** এর তাফসীর বা ব্যাখা। তাফসীরের প্রয়োজন এ জন্য হয়েছে যে, এ আয়াতে তিনটি বিষয় অস্পষ্ট রয়েছে। যথা-

১. কিরাআত কে পড়ছে?
২. তিনি কোন অবস্থায় কিরাআত পড়ছেন?
৩. কান লাগিয়ে শোনা এবং সম্পূর্ণ চুপ থাকার হুকুম কার জন্য?

ইমাম নাসায়ী রহ. রাসূল সা. এর হাদীসের দ্বারা তিনও প্রশ্নের সমাধান পেশ করেছেন। হাদীসটি হল-

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا قرء فانصتوا و إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد-

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন- ইমাম নির্ধারণ করা হয় এজন্য যে, তার ইক্তেদা করা হবে। সুতরাং সে যখন তাকবীর বলে, তোমরাও তাকবীর বল, সে যখন কিরাআত পড়ে, তোমরা চুপ থাক। আর সে যখন **سمع الله لمن حمده** বলে তোমরা **اللهم ربنالك الحمد** বল।
(নাসায়ী শরীফ-১/৮১৪৬)

এ হাদীস থেকে জানা গেল ইমাম কিরাআত পড়ছেন। নামাযের অবস্থায় চুপ থাকার হুকুম মুক্তাদীদের জন্য।

উল্লিখিত দলীলটি পাঁচটি বৈশিষ্টের অধিকারী। যথা-

১. এটি কোরআন শরীফের আয়াত।
২. আয়াতের উপর ইমাম নাসায়ী রহ. تأويل বা তাফসীরের শিরোনাম দিয়েছেন।
৩. এরপর হাদীসে সহীহ, মুত্তাসিল, মারফূ দ্বারা তাফসীর পেশ করেছেন।
৪. হাদীসটি সিহাহ সিত্তার অর্ন্তগত নাসায়ী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে।
৫. ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিমের প্রথম খন্ডের ১৭৪ নং পৃষ্ঠায় হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

এ শক্তিশালী দলীল দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম কিরাআত পড়ার সময় মুক্তাদী চুপ থাকবে। আর ইমাম যেহেতু জাহরী (যে নামাযে উচ্চ স্বরে কিরাআত পড়া হয়) ও সিররী (যে না নামাযে অনুচ্চস্বরে কিরাআত পড়া হয়) উভয় নামাযেই কিরাআত পড়েন, মুক্তাদী উভয় নমাযেই চুপ থাকবে। চাই কিরাআত সূরায়ে ফাতিহা হোক বা অন্য সূরা। আর এখানে استماع و إنصات তথা মনোযোগ দিয়ে শুনা ও চুপ থাকার ঐ অর্থই উদ্দেশ্য যা ইমাম বুখারী রহ.ও উল্লেখ করেছেন। বুখারী শরীফ প্রথম খন্ডের ৩নং পৃষ্ঠায় فاتبع قرأنه এর ব্যাখায় ইমাম বুখারী রহ. বলেন فاستع له و أنصت অর্থাৎ কান লাগিয়ে শুন এবং এমনভাবে চুপ থাক যেন জিহ্বা সামান্যও না নড়ে।

কিন্তু এ মাসআলায় আহলে হাদীসের নিকট এসব বৈশিষ্টের অধিকারী একটি দলীলও নেই। তারা শুধু কমযোর ও অন্য ব্যাখার অবকাশ রাখে, এমন হাদীস পেশ করেন। এমন শক্তিশালী দলীলের মোকাবালায় যা গ্রহণ করা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়।যদি তারা পারে যেন সিহাহ সিত্তার কোন কিতাব থেকে উক্ত আয়াতের তাফসীর পেশ করে। অন্যথায় কান লাগিয়ে শুনা এবং চুপ থাকার পথই আবলম্বন করে।

২. (من حديث طويل) فقال أبو موسى إن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطبنا فبين لنا سنتنا و علمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤم أحدكم فإذا كبر فكبروا و فى حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة و إذا قراء فأنصتوا -

আবু মুসা আশয়ারী রা. বলেন, রাসূল সা. একদিন আমাদেরকে নসীয়ত করলেন এবং সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করার জন্য উৎসাহিত করলেন। সাথে সাথে নামায পড়ার পদ্ধতি শিখালেন এবং বললেন, নামায পড়ার পূর্বে প্রথমে কাতার সোজা করে নিবে।এরপর তোমাদের থেকে একজন ইমাম হবে। ইমাম যখন তাকবীর বলবে তোমরাও তাকবীর বলবে। এ হাদীসেরই কাতাদা থেকে সুলাইমান, সুলাইমান থেকে জারীর কর্তৃক বর্ণিত সূত্রে রাসূল সা. বলেন- ইমাম যখন কিরাআত পড়বে, তোমরা চুপ থাকবে। (মুসলিম১/১৭৪)

৩. আবু মুসা আশয়ারী রা. বলেন- রাসূল সা. আমাদেরকে নামায শিখয়েছেন। বলেছেন, যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তোমাদের থেকে একজন ইমাম হবে। আর ইমাম যখন কিরাআত পড়বে তোমরা চুপ থাকবে।
(মুসনাদে আহমদ ৪/৪১৫, সহীহ আবী আওয়ানাহ ২/১৩৩, ইবনে মাজাহ ৬১)

৪. আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন- ইমাম এজন্যই নির্ধারণ করা হয় যে, তার ইক্তিদা করা হবে। যখন তিনি তাকবীর বলবেন তোমারাও তাকবীর বলবে। যখন তিনি কিরাআত পড়বেন, তোমার চুপ থাকবে।(নাসায়ী শরীফ ১/১০৭, মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩৭৭)

৫. আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন- ইমাম এজন্য নির্ধারণ করা হয় যে, তার ইক্তিদা করা হবে। যখন তিনি তাকবীর বলবেন তোমারও তাকবীর বলবে। যখন তিনি কিরাআত পড়বেন, তোমারা চুপ থাকবে। (ইবনে মাজাহ ৬১, মুসনাদে আহমদ ২/৩৭৬)

৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন- ইমাম যখন কিরাআত পড়বে তোমরা চুপ থাকবে। (কিতাবুল কিরাআত, বায়হাকী ১১৩)

৭. ওমর ইবনুল খত্তাব রা. বলেন, রাসূল সা. একদিন যোহরের নামায আদায় করলেন। একজন মনে মনে রাসূল সা. এর সাথে কিরাআত পড়তে লাগলেন। নামায শেষে রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন- তোমাদের কেউ আমার সাথে কিরাআত পড়েছে নাকি?
রাসূল সা. তিনবার এ প্রশ্ন করলেন। তখন একজন বলল- জী, হ্যাঁ ইয়া রাসুলুল্লাহ। আমি سبح اسم ربك الأعلى পড়ছিলাম। এ কথা শুনে রাসূল সা. বললেন কী হল? কিরাআত নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করা হচ্ছে কেন? ইমামের কিরাআত তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? ইমামতো এজন্যই বানানো হয় যে, তার ইক্তিদা করা হবে। সুতরাং ইমাম যখন কিরাআত পড়ে, তোমরা সম্পূর্ণ নীরব থাকবে।
(কিতাবুল কিরাআত ১১৫ও ১৬৩)

নবম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কারঃ

আহলে হাদীস বন্ধুরা যদি-

১. শুধু মাত্র এমন একটি হাদীসে সহীহ, সরীহ, মুত্তাসিল, মারফু পেশ করতে পারে যাতে রাসূল সা. মুক্তাদীকে و إذا كبر فكبروا - و إذا ركع فاركعوا- وإذا سجد فاسجدوا এর মত (و إذا قرء فاقرئوا) অর্থাৎ ইমাম যখন কিরাআত পড়বে তোমরাও কিরাআত পড়) এর হুকুম দিয়েছেন
এবং
২. উক্ত হাদীসের সিহ্যত এবং আমাদের হাদীসের যুয়ফ উম্মতের কারো মত ও উক্তির তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে পারে

আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব ।

তৃতীয় প্রকারঃ ইমামের সাথে রুকু পাওয়া মানে পুরো রাকআত পাওয়া

কোন মুক্তাদী ইমামের সাথে রুকুতে শামিল হলে সে উক্ত রাকাআত পেয়েছে বলে গণ্য করা হবে। তবে শর্ত হল, মুক্তাদী রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তাকবীরে তাহরীমা পরিমাণ দাঁড়াতে হবে এবং তাকবীরে তাহরীমাও বলতে হবে। মুক্তাদী উক্ত রাকাআত পাওয়ার কারণ হল ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। চাই সে শুরু থেকেই

ইমামের সাথে শরীক হোক বা মাঝখানে কিংবা রুকুতেই শামিল হোকনা কেন। এ থেকে বুঝা যায়, মুক্তাদীর উপর কিরাআত ফরয নয়। কারণ ফরয হলে যে মুক্তাদী ইমামকে রুকুতে পেয়েছে তার উক্ত রাকাআত না হওয়ারই কথা। অথচ হাদীসে এর বিপরীত কথাটাই এসেছে। দেখুন-

১. عن أبي بكرة انه انتهى إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: زادك الله حرصا و لا تعد-

অর্থাৎ: আবু বকরা রা. একদিন এমন অবস্থায় মসজিদে পৌঁছলেন যে, রাসূল সা. রুকুতে ছিলেন। তাই তিনি নামাযের কাতারে পৌঁছার পূর্বেই রুকু করলেন। নামায শেষে রাসুল সা. তাকে লক্ষ্য করে বললেন- আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিন। আর তোমার নামায পুনরায় পড়তে হবে না। (বুখারী শরীফ ১/১০৮)
'বুলুগুল মারাম' এর ব্যাখ্যাকার হাফেজ মুহাম্মদ ইসমাঈল রহ. বলেন হাদীসের لا تعد শব্দটি إعاده থেকে উদগত। অর্থাৎ আল্লাহ তোমার মাঝে পারলৌকিক কল্যাণ ত্বলবের আরো আগ্রহ দান করুক। আর নামায পুনরায় পড়তে হবেনা। কেননা তোমার নামায আদায় হয়ে গেছে। (সুবুলুস সালাম ২/৫৩ হাদীস নং ২১)

২. عن أبي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة و نحن سجود فاسجدوا و لا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة-

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন- তোমরা নামাযে এসে আমাকে সিদজায় পেলে সিজদা করে নাও। তবে এ সিজদাকে গণ্য করনা। হ্যাঁ যে রুকু পেল সে উক্ত রাকাআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। (আবু দাউদ শরীফ- ১/১২৯)

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমাম কোমর সোজা করার পূর্বেই রুকুতে শরীক হল, নিঃসন্দেহে সে উক্ত রাকাআত পেয়ে গেল।

হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী রহ. তালখিসে হাবীর (২/৪১) এর মধ্যে লিখেছেন আমি সহীহ ইবনে খুযাইমা এর মাঝে এ হাদীসটি পেয়েছি।

এ সম্পর্কে আরো হাদীস দেখার জন্য ফাতওয়ায়ে সাত্তারিয়া প্রথম খন্ড ৫৩-৫৭ পৃষ্ঠা এবং সাহাবীগণের আমল দেখার জন্য করাচী থেকে প্রকাশিত মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বার প্রথম খন্ডের ২৪৩, ১৪৪, ২৫৪, ২৫৫ পৃষ্ঠাসমূহ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

দশম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুরা যদি

১. শুধুমাত্র এমন একটি সহীহ, সরীহ, মুত্তাসিল, মারফু, হাদীস পেশ করতে পারে যাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, রুকুতে অংশগ্রহণকারীর জন্য উক্ত রাকাআত গণ্য করা হবে না।

এবং

২. উক্ত হাদীসের সিহ্যত ও আমাদের হাদীসের যুয়ফ উম্মতের কারো মত ও উক্তির তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে পারে

আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

চতুর্থ প্রকার: ইমামের পিছনে কিরাআত না পড়লেও নামায শুদ্ধ হবে

১ .আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন- যে নামাযে সূরায়ে ফাতিহা পড়া হয় না সে নামায নাকেস বা অপূর্ণ। তবে যদি ইমামের পিছনে হয়। (অর্থাৎ সে নামায সূরায়ে ফাতিহা পড়া ব্যতীতই পূর্ণ।) (কিতাবুল কিরাআত, বায়হাকী, ১৭১)

২. জাবের রা. বলেন, আমি রাসুল সা. থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি নামায পড়ল কিন্তু সুরায়ে ফাতিহা পড়ল না। যেন সে নামাযই পড়ল না। তবে যদি সে ইমামের পিছনে নামায আদায় করে।

(কিতাবুল কিরাআত, বায়হাকী, ১৩৬)

৩. জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন- যে নামাযে সূরায়ে ফাতিহা পড়া হয়না সে নামায নাকেস বা অপূর্ণ। তবে যদি ইমামের পিছনে আদায় করে।

(কিতাবুল কিরাআত, বায়হাকী, ১৭১ ও ১৩৬ এবং সুনানে কুবরা রায়হাকী ২/৬৯)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন- যে ব্যক্তি নামাযে সূরায়ে ফাতিহা পড়ল না তার নামায হয়নি। তবে যদি সে ইমামের পিছনে আদায় করে থাকে। (কিতাবুল কিরাআত, ১৭১)

উল্লিখিত হাদীসসমূহ ছাড়াও অধিক অবগতির জন্য কিতাবুল কিরাআত ১৩৮ ও ১২২, সুনানে দারাকুতনী প্রথম খন্ডের ৩২৭ নং পৃষ্ঠা, মুআত্তা মালেকের ৬১নং পৃষ্ঠা, সুনানে তিরমিযির ৭১ নং পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

ইবনে হাজর আসকালানী রহ. শরহে নুখবাতুল ফিকার গ্রন্থে লিখেন- وبكثرة طرقه يصحح অর্থাৎ কোন যয়ীফ হাদীস অনেক সূত্রে বর্ণিত হলে তা সহীহ বলে গণ্য হবে। (পৃষ্ঠা নং- ৩৩)

পঞ্চম প্রকার: ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ার ব্যাপারে শক্ত নিষেধাজ্ঞা।

১. রাসূল সা. ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া থেকে নিষেধ করেছেন।

(মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/১৩৯)

২. মুসা ইবনে উকবা রা. বলেন, রাসূল সা., আবুবকর রা., ওমর রা., ওসমান রা.–ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া থেকে নিষেধ করতেন।

(মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/১৩৯)

৩. আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা রা. বলেন– আলী রা. ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া থেকে নিষেধ করতেন।

(মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/১৩৮)

৪. যায়দ ইবনে আসলাম রা. বলেন– আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তে নিষেধ করতেন

(মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/১৪০)

৫. ওমর রা. বলেন –আমার নিকট সমীচীন মনে হয়ে, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়বে,তার মুখ পাথর দ্বারা পূর্ণ হোক।

(মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/১৩৮)

৬. আলী রা. বলেন– যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ে সে মন্দ স্বভাবের আধীকারী। (মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/১৩৭)

৭. আলী রা. বলেন –যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ল তার নামাযই হয়নি। (মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/১৩৯)

৮. যায়দ ইবনে ছাবিত রা. বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ল তার নামায হয়নি।

(মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/১৩৭, মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৪১৩)

৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন যে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ে তার মুখ মাটি দিয়ে ভরে দেয়া হোক।

(মছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/১৩৮)

১০.সাদ রা. বলেন –ইমামের পিছনে যে কিরাআত পড়ে,তার মুখে জ্বলন্ত কয়লা হওয়া আমি সমীচীন মনে করি।

(মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৪১২)

১১. আসআদ ইবনে ইয়াযীদ তাবেয়ী রহ. বলেন – ইমামের পিছনে যে কিরাআত পড়ে তার মুখ মাটি দিয়ে ভরে দেয়া আমার নিকট পছন্দনীয়। (মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/১৩৮)

১২. আলকমাহ ইবনে কায়স রা. বলেন –যে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ে আমার পছন্দ হল তার মুখে উওপ্ত পাথর ভরে দেয়া।

(মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/১৩৯)

এগারতম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুদের প্রতি আহবান হল – যদি তারা

১. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ এবং বাকী **১১৩** সূরা পড়া হারাম, একথা রাসূল সা. এর হাদীসে সহীহ, সরীহ, মারফু, মুত্তাসিল দ্বারা প্রমাণ করতে পারে

২. ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ার ব্যাপারে রাসূল সা. এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আবশ্যকীয় হুকুম পেশ করতে পারে।

৩. ইমামের পিছনে কিরাআত না পড়ার ব্যাপারে রাসূল সা. এর কোন শক্ত ধমকসুলভ সহীহ হাদীস পেশ করতে পারে।

এবং

৪. ঐসব হাদীসের সিহ্যত ও আমাদের হাদীসসমূহের যুয়ফ, উম্মতের কারো মত ও উক্তির তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে পারে ,

আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব ।

উভয় পক্ষের হাদীস ও সমাধান:

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার বিষয়ে পাঁচ ধরণের হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

১. **عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا صلاة لمن لم يقرء بأم القران فصاعدا-**

অর্থাৎ- উবাদা ইবনুস সামিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন- ঐ ব্যক্তির নামায হয়নি যে সূরায়ে ফাতিহা পড়েনি এবং সূরাও মিলায়নি। (মিশকাত শরীফ-১/৭৮, মুসলিম শরীফ)

২. **عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب -**

অর্থাৎ- উবাদা ইবনুস সামিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন- ঐ ব্যক্তির নামায হয়নি যে সূরায়ে ফাতিহা পড়ল না।

(মিশকাত শরীফ-১/৭৮)

নোট: এ হাদীসে সূরায়ে ফাতিহার সাথে সূরা মিলাতে বলা হয়নি। আবার নিষেধও করা হয়নি।

৩. **عن عبادة الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فلا تقرئوا بشيئ من القران إذا جهرت إلا بأم القران-**

অর্থাৎ- উবাদা ইবনুস সামিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন- সুতরাং আমি যখন উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ব তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতিত কোরআন থেকে কিছুই পড়বে না।

(মিশকাত শরীফ-১/৮১, আবু দাউদ শরীফ)

নোট: এ হাদীসে সিররী ও জাহরী নামাযের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে। জাহরী নামাযে (ফজর, মাগরিব, এশা) সূরায়ে ফাতিহার পর অন্য কোন আয়াত বা সূরা মিলাতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু সিররী নামাজে (যোহর, আছর) নিষেধ করা হয়নি। যা হাদীসের প্রতি খেয়াল করলে স্পষ্ট বুঝা যায়। অন্যথা জাহরীকে খাছ করার ফায়দা কী?

সুতরাং এ হাদীসের সারাংশ হল- জাহরী নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে। অন্য কোন সূরা মিলানো যাবে না। আর সিররী নামাযে সূরায়ে ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোরও ইজাযত আছে।

৪. عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقرائة فقال: هل قرء معى أحد منكم آنفا؟ فقال: رجل يا رسول الله! قال: إني أقول ما لى أنازع فى القران؟ قال: فانتهى الناس -نعم عن القرائة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ما جهر فيه بالقرائة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى عليه وسلم-

অর্থাৎ- আবু হুরায়রা রা. বলেন, একদিন রাসূল সা. এক জাহরী নামায শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন- কেউ কি আমার সাথে কিরাআত পড়েছে? একজন বলল- জী হা ইয়া রাসূলুল্লাহ!
তখন রাসূল সা. বললেন - কী হল? কোরআন নিয়ে আমার সাথে টানা টানি করা হয় কেন?
আবু হুরায়রা রা. বলেন- রাসূলুল্লাহ সা. এর একথা শুনে লোকেরা জাহরী নামাযে ইমামের সাথে কিরাআত পড়া ছেড়ে দিল। অর্থাৎ জাহরী নামাযে সূরা ফাতিহা কিংবা অন্য সূরা পড়া থেকে বিরত থাকল। (কিন্তু এরপরও সিররী নামাযে কিরাআত পড়া অব্যাহত ছিল।)

৫. عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرء فانصتوا -

অর্থাৎ- আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন- ইমাম এ জন্যই নির্ধারণ করা হয় যে, তার অনুসরণ করা হবে। সুতরাং যখন সে তাকবীর বলবে, তোমারাও তাকবীর বলবে। আর যখন সে কিরাআত পড়বে তোমরা চুপ থাকবে।

(মিশকাত শরীফ ১/৮১, আবু দাউদ শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ)

নোট: এ হাদীসে সিররী ও জাহরী এবং ফাতিহাও অন্য সূরার মাঝে ব্যবধান না করে সর্বাবস্থায় চুপ থাকার জন্য বলা হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সমাধান:

সিররী ও জাহরী এবং সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য সূরার মাঝে পার্থক্য করা ও না করা এবং নিষেধ করা ও না করা সংক্রান্ত পাঁচটি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সবগুলো হাদীসের মাঝে সমন্বয় করে ইমাম আবু হানিফা রহ. এক চমৎকার সমাধান প্রদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে তার ফকীহ ও মুজাতাহিদসুলভ রায় হল- কিরাআতের মাসআলায় একাধিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সবশেষে ইমামের কিরাআতকে মুক্তাদীর কিরাআত সাব্যস্ত করে মুক্তাদীকে যে কোন নামাযে যে কোন ধরণের কিরাআত থেকে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে।

বারতম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুরে প্রতি আহ্বান হল, যদি তারা

১. নবী সা. এর হাদীসে সহীহ, সরীহ, মারফূ, মুত্তাসিল থেকে কোন প্রকার তাবীল বা ব্যাখার আশ্রয় না নিয়ে উল্লিখিত সাংঘর্ষিক হাদীসসমূহের স্পষ্ট সমাধান পেশ করতে পারে এবং
২. উক্ত হাদীসের সিহ্যত উম্মতের কারো মত ও উক্তির তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে পারে,

তাহলে আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

আহলে হাদীস সমীপে একটি প্রশ্ন:

ইবনে মাজাহ শরীফ পৃষ্ঠা নং-৮৭ ও মুসনাদে আহমদ ২নং খন্ড ২৩২নং পৃষ্ঠায় আছে– রাসূল সা. মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায় মসজিদে তাশরীফ রাখলেন । তখন আবু বকর রা. ইমাম থেকে মুকাব্বির হয়ে গেলেন। আবু বকর রা. মুকাব্বির হওয়ার পূর্বে যে পর্যন্ত কিরাআত পড়েছিলেন। রাসূল সা. সেখান থেকেই পড়তে শুরু করলেন । এ হাদীস অনুযায়ী রাসূল সা. এর পুরো ফাতিহা কিংবা ফাতিহার কিছু অংশ পড়া হয়নি। এখন আহলে হাদীস বন্ধুদের সমীপে বিনীত জিজ্ঞাসা এই যে, রাসূল সা. এর সে নামায হয়েছে কিনা?

সপ্তম মাসআলা: আমীন আস্তে বলা সুন্নত

প্রশ্ন : আহলে সুন্নত আমীন আস্তে বলে, এর কোন দলীল আছে কি?
উত্তর: যথেষ্ট দলীল রয়েছে। দেখুন-

১. قال موسى ربنا إنك الخ - ১১তম পারার এ আয়াতে আল্লাহ তা'আয়ালা মুসা আ. এর দু'আর বিবরণ দিয়েছেন। এরপর قد أجيبت دعوتكم বলে দু'আ কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-তোমাদের উভয়ের দু'আ কবুল করা হয়েছে। বিবৃত এ দু'আ মুসা ও হারুন আ. এর সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। মুসা আ.দু'আ করছিলেন আর হারুন আ. আমীন আমীন বলছিলেন। আল্লাহ যখন হারুন আ. এর আমীন বলাকেও দু'আ বলে অভিহিত করেছেন, বুঝা গেল আমীনের বিধানও দু'আর বিধানের অনুরূপ হবে।(তাফসীরে দুররে মানছুর ৩/৩১৫, তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৩১ তাফসীরে খাযেন ২/৩০৬)

* قال: عطاء أمين دعاء আতা তাবেয়ী রহ. বলেন- আমীন হল দু'আ।
(বুখারী শরীফ ১/১০৭)

* আমীন শব্দের অর্থ হল اللهم استجب হে আল্লাহ! কবুল কর।
(তাফসীরে খাযেন ২/৩০৬)

কোরআনী সমাধান:

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমীন শব্দটি আভিধানিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই দু'আর অর্ন্তভুক্ত।

আর দু'আ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা হল ادعو ربكم تضرعا وخفية নীচু স্বরে ব্যাকুল হৃদয়ে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দু'আ কর। সুতরাং এ আলোচনার নিরিখে আমীন আস্তে বলাই কুরআনের দাবী।

২. عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه-

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যখন ইমাম غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলবে তখন মুক্তাদী আমীন বলবে। যার আমীন ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিল হবে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। (মুসলিম শরীফ ১/১৭৬)

নোট: ফিরিশতাদের আমীন আস্তেই হয়। আজ পর্যন্ত কেউ ফেরেশতাদের আমীন ধ্বনি শোনেনি। তাদের আমীনের সাথে মিলতো তখন হবে যদি সময় এক হয় এবং আওয়াজও আস্তে হয়।

৩. فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر سكتة إذا فرغ من قرائة غير المغضوب عليهم و لا الضالين-

সামুরাহ ইবনে জুনদুব রা. বলেন, রাসূল সা. দু' স্থানে সাকতা করতেন অর্থাৎ আওয়াজ ছোট করতেন । তাকবীরে তাহরীমা বলার পর (ছানা পড়ার সময়) এবং غير المغضوب عليهم و لا الضالين পড়ার পর (আমীন বলার সময়)।

৪. عن وائل بن حجر أن النبى صل الله عليه وسلم قرء غير المغضوب عليهم و لا الضالين- فقال أمين----- وخفض بها صوته-

অয়েল ইবনে হুজর রা. বলেন, রাসূল সা. আমাদেরকে নামায পড়ালেন। নামাযে غير المغضوب عليهم و لا الضالين বলার পর আমীন বললেন। এ সময় আওয়াজ নীচু করেছিলেন।
(মুসনাদে আহমদ৪/৩১৬, দারাকুতনী ১/৩৩৪, মুসতাদরাকে হাকেম ২/২৩২, সুনানে বায়হাকী ২/৫৭, তিরমিযী ১/৫৮)

৫. ওমর রা. বলেন, ইমাম চার জিনিস আস্তে বলবে। بسم الله - أعوذ بالله اللهم ربنالك الحمد ও - أمين
(কানযুল উম্মাল ৮/২৭৪, বেনায়া ১/৬২০, মুহাল্লা ইবনে হজম ২/২০৯)

৬. আবু অয়েল বলেন- আলী রা. এবং ইবনে মাসউদ রা. بسم الله - أعوذ بالله - أمين -উঁচু আওয়াজে বলতেন না। (মু'জাম তাবারানী-৯/২৬৩)

৭. ইব্রাহীম নাখয়ী তাবেয়ী রহ. এর ফতওয়া হল- পাঁচটি জিনিস আস্তে বলা হবে سبحان الله - أعوذ بالله- بسم الله- أمين- ربنا لك الحمد
(মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ২/৮৭, মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-২/৫৩৬)

মূল বির্তক:

আহলে সুন্নত ও আহলে হাদীসের মধ্যকার মতভেদ আমীন বলা এবং না বলা নিয়ে নয়। বরং আস্তে আর জোরে বলা নিয়ে। আহলে সুন্নত বলে উল্লিখিত দলীলের আলোকে বুঝা যায় শুরুতে আমীন উচুস্বরে বলার বিধান থাকলেও পরবর্তীতে তা পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর আহলে হাদীসের দাবী হল, রাসূল সা. জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমীন উঁচু আওয়াছে বলেছেন। আহলে সুন্নতের দলীল উপরে পরিবেশিত হল। এখন আহলে হাদীসের কর্তব্য হল- তাদের দাবীর পক্ষে দলীল পেশ করা।

তেরতম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুদের প্রতি আহ্বান হল- তারা যদি প্রমাণ করতে পারে যে,

১. রাসূল সা. এর জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত নামাযে ইমাম-মুক্তাদীর জোরে আমীন বলা অব্যাহত ছিল,
২. ইমাম দৈনিক ১৭ রাকাআত নামায থেকে ফরযের ৬ রাকাআতে (ফজর ২+ মাগরিব ২+ ইশা ২) আমীন জোরে বলবে। আর বাকী ১১ রাকাআতে আমীন আস্তে বলবে,
৩. অনুরূপ মুক্তাদীও ৬ রাকাআতে আমীন উচুঁ আওয়াজে আর বাকী ১১ রাকাআতে নীচু আওয়াজে বলবে,
৪. মুনফারিদ (একাকী নামায আদায়কারী) সব রাকাআতে আমীন আস্তে বলবে হবে এবং
৫. সুন্নত ও নফল নামাযে আমীন আস্তে বলতে হবে।
৬. তাদের পেশকৃত হাদীসসমূহের সিহ্যত এবং আমাদের দলীলসমূহের যুয়ফ উম্মতের কারো তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে পারে-

আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

অষ্টম মাসআলা: রুকুতে গমনকালে রফয়ে ইয়াদাইন

প্রশ্ন: আহলে সুন্নতের নিকট রফয়ে ইয়াদাইন না করার কোন দলীল আছে কি?

উত্তর: যথেষ্ট দলীল রয়েছে। তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. **عن عبد الله أنه قال: ألا أصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة-**

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন- আমি কি তোমাদেরকে রাসূল সা. এর নামায পড়ে দেখাব না? এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং শুধুমাত্র একবার হাত উত্তোলন করলেন। (নাসায়ী শরীফ- ১/১৬১)

২. **عن عبد الله قال: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد -**

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন- আমি কী তোমাদেরকে রাসূল সা. এর নামাযের অবস্থা বর্ণনা করব না? এরপর তিনি (নামাযে) দাঁড়ালেন এবং প্রথম বার হাত উত্তোলন করলেন। পুরো নামাযে আর হাত উত্তোলন করেন নি। (নাসায়ী শরীফ- ১/১৫৮)

৩. **عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله سلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة و لا يعود بشئ من ذلك-**

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন- রাসূল সা. শুধু নামায শুরু করার সময় হাত উত্তোলন করতেন। এরপর আর কখনো উত্তোলন করতেন না।

নোট: আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কে অবগত সকলের নিকটেই একথা স্পষ্ট যে, উল্লিখিত হাদীসসমূহে হরফে ইসতিছনা ব্যবহার করা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল সা. শুধু নামাজের শুরুতেই হাত উত্তোলন করতেন।

৪. বারা ইবনে আযেব রা. বলেন রাসূলুল্লাহ সা. তাকবীর বলার সময় একবার শুধু হাত উত্তোলন করতেন। এরপর ঐ নামাযে আর রফয়ে ইয়াদইন করতেন না। (মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ২/৭১)

৫. **عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول صلى عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم، السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شانكم؟ تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس -**

জাবের ইবনে সামুরা রা. বলেন- আমরা সালামের সময় উভয় দিকে হাত দ্বারা ইশারা করতাম। রাসূল সা. দেখে বললেন- তোমরা রফয়ে ইয়াদাইন করছ কেন? মনে হয় যেন তোমাদের হাত উশৃংখল ঘোড়ার লেজ। (মুসলিম শরীফ- ১/১৮১)

নোট: নামাযে বান্দা মহান মা'বুদের দরবারে হাজির হয়। মা'বুদের দরবারে অযথা হরকত-নড়াচড়া থেকে বিরত থাকা উচিৎ। এ জন্যই অত্র হাদীসে তিরস্কার করে উত্তোলিত হাতকে উশৃংখল ঘোড়ার লেজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন মা-বাবা কষ্ট পান বিধায় তাদের প্রতি বিরক্তিমূলক 'উফ' বলতে নিষেধ করা হয়েছে। যার থেকে গালি দেয়া, প্রহার করা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। অনুরূপ নামাযের শেষের নড়াচড়া যদি নামাযের আদব-স্থিরতার পরিপন্থী হয়, নামাযের মাঝে নড়াচড়া থেকে আরো বেশী বিরত থাকা উচিৎ।

৬. **عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لى أراكم رافعى أيديكم؟ كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا فى الصلاة -**

জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. সাহাবায়ে কেরামকে রফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখে বললেন- আমি তোমাদেরকে রফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখছি। মনে হচ্ছে যেন তোমাদের হাতগুলো অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মত। নামাজে শান্ত থাক। (মুসলিম শরীফ- ১/১৮১)

৭. **كان أصحاب عبد الله و أصحاب على لا يرفعون أيديهم إلافى افتتاح الصلاة ثم لا يعودون-**

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও আলী রা. এর শাগরেদরা শুধু নামাযের শুরুতে হাত উত্তোলন করতেন। এরপর আর করতেন না। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা- ১/২৬)

৮. **عن مجاهد قال ما رأيب ابن عمر يرفع يديه إلا فى أول ما يفتتح-**

মুজাহিদ তাবেয়ী রহ. বলেন- আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কে শুধু নামাজের শুরুতেই হাত উত্তোলন করতে দেখেছি। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা- ১/২৬৮)

৯. **عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : كأنى بقوم يأتون من بعدى يرفعون أيديهم فى الصلاة كأنها أذناب خيل شمس-**

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন- যেন আমি এক কওম দেখছি যারা আমার পরে আসবে। যারা নামাযে এমনভাবে রফয়ে ইয়াদাইন করবে, মনে হবে তাদের হাতগুলো অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মত। (আল জামেউস সহীহ মুসনাদুল ইমাম আর রবী -১/৪৫)

নোট: এ হাদীসের উদ্দেশ্য হল- এসব মানুষেরা রফয়ে ইয়াদাইন কেই পূর্ণ দ্বীন মনে করবে। আর রফয়ে ইয়াদাইন নিয়ে বাড়াবাড়ি করেই গোমরাহীর জালে ফেসে যাবে। তাদের আক্বীদাও নষ্ট হবে এবং তারা অন্যদের আক্বীদাও নষ্ট করবে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রহ. এ হাদীসের উদ্দেশ্য নন। তারা ছিলেন শুদ্ধ আকীদার অধিকারী। (তারা বাড়াবাড়ি করতেন না। বরং অন্যান্য ইমামদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।)

ফায়দা:

যেহেতু তাকবীরে তাহরীমা, তাকবীরে কুনুত, তাকবীরে ঈদ এসবে রফয়ে ইয়াদাইনের সাথে যিকরুল্লাহ (আল্লাহ আকবার) আছে এজন্য এগুলোতে রফয়ে ইয়াদাইন জারী রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য রফয়ে ইয়াদাইনে যেহেতু যিকরুল্লাহ নেই, এজন্য রফয়ে ইয়াদাইন রহিত করা হয়েছে। স্মর্তব্য যে, **السلام عليكم** و رحمة الله দ্বারা যিকরুল্লাহ উদ্দেশ্য নয় বরং কালামুন্নাছ বা দু'আ উদ্দেশ্য। এজন্য এক্ষেত্রে রফয়ে ইয়াদাইনের বিধান রাখা হয়নি। বরং তা দ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যায়।

আহলে হাদীসের আমল:

১. আহলে হাদীস চার রাকাআত নামাযে দশ স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন করে। প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতের শুরুতে। চার রুকুর পূর্বে ও পরে।

২. ১৮ স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন করেনা। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রাকাআতের শুরুতে। ৮ সিজদার পূর্বে ও পরে।

৩. তাদের নিকট ১০ স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন ফরয। আর ১৮ স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন নিষিদ্ধ।

৪. তাদের দাবী হল- রাসূল সা. জীবনের শেষ পর্যন্ত এ আমল করেছেন। অর্থাৎ ১০ স্থানে উত্তোলন করা, ১৮ স্থানে না করা।

৫. রফয়ে ইয়াদাইন ব্যতীত নামায বাতিল।

চৌদ্দতম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুদের প্রতি আহ্বান হল- যদি তারা

১. তাদের এ সকল আমল এবং দাবীর পক্ষে একটি কওলী (বক্তব্যমূলক) এবং একটি ফে'লী (কর্মমূলক) সহীহ, সরীহ, মারুফ, মুত্তাসিল হাদীস পেশ করতে পারে এবং

২. উক্ত হাদীসের সিহ্যত উম্মতের কারো মত ও উক্তির তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে পারে

আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

পনেরতম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুরা যদি-

১. তাদের উর্দূ বুখারী প্রথম খন্ড, ৪৬৮ নং পৃষ্ঠা ৪৭৪ নং পরিচ্ছেদ ও ৪নং টীকা অনুযায়ী- যা শিয়াদের কুরআনের মত কোন গর্তে মুদ্রিত হয়েছে- আশারায়ে মুবাশ্‌শারা সহ উক্ত কিতাবে উল্লিখিত ৫০ জন সাহাবীর প্রত্যেকের নামে হাদীস পেশ করতে পারে

এবং

২. উক্ত হাদীসসমূহের সিহ্যত উম্মতের কারো মত ও উক্তির তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে পারে-

আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

আহলে হাদীস সমীপে একটি প্রশ্ন:

তিরমিযী শরীফ ১ম খন্ডের ৫৯ নং পৃষ্ঠায় আছে- অনেক সাহাবা রফয়ে ইয়াদাইন না করার প্রবক্তা ছিলেন। এখন প্রশ্ন হল- তাদের নামায হয়েছে, না হয়নি? তারা নামাযী ছিলেন না বে-নামাযী? তারা রাসূল সা. এর অনুসরণ করে ছিলেন না বিরোধিতা? তারা হক পন্থী ছিলেন না বাতিল? তারা জান্নাতী না জাহান্নামী?

নবম মাসআলা: সিজদায় গমনের তরীকা

প্রশ্ন: সিজদায় যাওয়ার সুন্নত তরীকা কী?

উত্তর: সিজদায় যাওয়া সম্পর্কে দু'ধরনের হাদীস রয়েছে। যথা:

প্রথম প্রকার- যমীনের উপর প্রথম হাটু রাখা হবে। যেমন-

عن وائل بن حجر قال رأيت النبى صل الله عليه و سلم إذا سجد وضع ركبته قبل يديه و إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه -

অয়েল ইবনে হুজর রা. বলেন- আমি রাসূল সা. কে দেখেছি যখন তিনি সিজদা করতেন তখন (যমীনের উপর) হাতের পূর্বে হাটু রাখতেন। আর দাঁড়ানোর সময় হাটুর পূর্বে হাত উঠাতেন।

(আবু দাউদ ১/১২২, তিরমিযী ১/৩৬, নাসায়ী ১/১৬৫)

দ্বিতীয় প্রকার:

১. **عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك االبعير و ليضع يديه قبل ركبتيه -**

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন- সিজদাকারীর উচিৎ যে সিজদা কালে (যমীনের উপর) হাটুর পূর্বে হাত রাখবে।

(আবু দাউদ- ১/১২২)

২. এ হাদীসটি নাসায়ী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (১/১৬৫)

ইমামে আযমের সমাধান:

অত্র মাসআলায় উভয় প্রকারের হাদীস পরস্পর বিরোধী। এজন্য ইমাম আবু হানীফা রহ. সমাধানের জন্য সাহাবায়ে কেরামের আমলকে ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন। দলীল পরস্পর বিরোধী হলে সাহাবায়ে কেরামের

আমল থেকে সমাধান বের করা, তাঁর অন্যতম মূলনীতি। তাই তিনি বলেন- মূল সুন্নত হল প্রথমে যমীনে হাটু স্থাপন করা। হ্যাঁ কারো ওযর থাকলে সে এর বিপরীত করতে পারে।

সাহাবায়ে কেরামের আমল ও উক্তি:

১. ইব্রাহীম নখয়ী রহ. থেকে বর্ণিত- ওমর রা. প্রথমে হাটু তারপর হাত রাখতেন। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-১/২৯৪)

২. আসওয়াদ তাবেয়ী রহ. থেকে বর্ণিত- ওমর রা. হাটুর উপর সিজদায় গমন করতেন। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৯৫)

৩. নাফে রহ. থেকে বর্ণিত- ওমর রা. সিজদায় গমনকালে প্রথমে হাটু তারপর হাত রাখতেন। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৯৫)

৪. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর শিষ্যরা সিজদায় গমন কালে তাদের হাটু, হাতের পূর্বে পতিত হত। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৯৫)

৫. ইব্রাহীম নখয়ী রহ. কে ঐ ব্যক্তি সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হলে যিনি হাটুর পূর্বে হাত রাখেন, তিনি বললেন- এমন কাজ সেই করবে যে পাগল। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৯৫)

ষোলতম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুদের প্রতি আহবান হল- যেহেতু তারা তাকলীদকে শিরক মনে করেন এবং দ্বীনি মাসআলায় কিয়াসকে শয়তানের কাজ আখ্যা দেন, তারা অবশ্য অবশ্যই এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকবেন। আর উল্লিখিত বিরোধপূর্ণ হাদীসসমূহের সমাধান রাসূল সা. এর হাদীস থেকে পেশ করবেন। যদি তারা-

১. রাসূল সা. এর হাদীসে সহীহ, সরীহ, মুত্তাসিল, মারফু দ্বারা উক্ত বিরোধের সমাধান প্রদান করতে পারেন এবং

২. উক্ত হাদীসের সিহ্যত উম্মতের কারো মত বা উক্তির তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে পারেন

আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

দশম মাসআলা: সিজদা থেকে উঠার ত্বরীকা

প্রশ্ন: প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতে সিজদা থেকে উঠার নিয়ম কী?

উত্তর: প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতে দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। সিজদা ও দাঁড়ানোর মাঝে কোন বৈঠক করবেনা। তবে বসে তারপর দাঁড়ানোর কথাও আছে। উভয় প্রকারের হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হল।

সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার দলীল:

১. **عن أبي حميد الساعدى رضى الله عنه ثم كبر فسجد ثم كبر فقام و لم يتورك-**

আবু হুমাইদ সায়েদী থেকে বর্ণিত- এরপর রাসূল সা. তাকবীর বললেন। এরপর সিজদা করলেন। এরপর সোজা দাঁড়িয়েগেলেন। মাঝখানে কোন বৈঠক করেন নি। (আবু দাউদ ১/১০৭)

২. **عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض فى الصلاة على صدور قدميه- قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل فى الصلاة على صدور قدميه -**

আবু হুরায়রা রা. বলেন- রাসূল সা. সিজদা থেকে উঠার সময় পায়ের পাঁচ আঙ্গুলের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে যেতেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন- আহলে ইলম আবু হুরায়রা রা. এর হাদীসের উপরই আমল করেন। তারা এটাই পছন্দ করেন যে, মুসল্লী পায়ের পাঁচ আঙ্গুলের উপর ভর করেই দাঁড়িয়ে যাবে। (তিরমিযী-১/৬৫)

৩. আবু মালিক আশয়ারী রা. কর্তৃক আপন কওমের লোকদেরকে নামায প্রশিক্ষণ প্রদানমূলক হাদীসে আছে- তিনি তাকবীর বললেন, এরপর সিজদা করলেন, এরপর সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন। (মুসনাদে আহমদ-৫/৩৪৩)

৪. **عن هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ---------- ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما -**

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. একজনকে (খল্লাদ ইবনে রাফে') নামায শিখাতে গিয়ে বলেন- তুমি স্থিরতার সাথে সিজদা কর। এরপর সিজদা থেকে উঠে সোজা দাড়িয়ে যাও।

(বুখারী-২/৯৮৬)

৫. অতি মর্যাদা সম্পন্ন তাবেয়ী শা'বী রহ. বলেন- ওমর রা., আলী রা. এবং রাসূল সা. এর অন্যান্য অনেক সাহাবী নামাযে সিজদা থেকে পায়ের আঙ্গুলের মাথায় ভর করে দাঁড়িয়ে যেতেন।

(মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/১৯৪)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. বলেন- আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের প্রতি খুব খেয়াল করে দেখেছি। আমি লক্ষ্য করেছি যে, তিনি প্রথম এবং তৃতীয় রাকআতে সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় বসতেন না। বরং আঙ্গুলের উপর ভর করেই দাঁড়িয়ে যেতেন।

(মু'জাম তাবরানী কাবীর ৯/২৬৬, সুনানে কুবরা বায়হাকী- ২/১২৫)

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. দ্বিতীয় সিজদা করার পর পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে যেতেন।

(মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-১/৩৯৪)

৮. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. নামাযে পায়ের আঙ্গুলে ভর করে দাঁড়িয়ে যেতেন। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-১/৩৯৪)

৯. ইমাম আ'মাশ রহ. বলেন– আমি উমারাহ ইবনে উমাইরকে আবওয়াবে কিনদাহর দিকে নামায পড়তে দেখলাম। আমি লক্ষ্য করলাম- তিনি রুকু করলেন। এরপর সিজদা করলেন। দ্বিতীয় সিজদা করার পর যেভাবে ছিলেন সেভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষে আমি বিষয়টি নিয়ে তার সাথে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন- আমাকে আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ হাদীস বর্ণনা করেন যে, তারা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে দেখেছেন– তিনি নামাযে পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে যান।

ইমাম আ'মশ বলেন– আমি এ হাদীস টি ইব্রাহীম নখয়ীর নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন– আমাকে আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে এমন করতে দেখেছেন।

ইমাম আ'মাশ রহ. বলেন– এরপর আমি এ হাদীস খাইছমাহ ইবনে আব্দুর রহমানের নিকট বয়ান করলাম। তিনি বললেন– আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কে দেখেছি- তিনি পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে যেতেন।

ইমাম আ'মাশ রহ. বলেন– আমি এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে ছাকাফীর নিকট বর্ণনা করেছি। তিনি বলেন– আমি আব্দুর রহমান ইবনে আবু লাইলা কে দেখেছি। তিনিও আঙ্গুলের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে যেতেন।

ইমাম আ'মাশ রহ. বলেন– আমি এ হাদীসটি আতিয়্যা আওফীর নিকট বয়ান করেছি। তিনি বলেন– আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আবু সাঈদ খুদরী রা. কে দেখিছি। তারাও আঙ্গুলের মাথায় ভর করেই দাঁড়িয়ে যেতেন। (সুনানে কুবরা, রায়হাকী, ২/১২৫)

১০। নোমান ইবনে আবু আয়্যাশ রহ. বলেন– আমি রাসূল সা. এর অগণিত সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছি, যারা প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতের সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তো সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩৯৫)

১১। হাদীসের প্রথম সংকলক ইমাম যুহরী রহ. বলেন– আমাদের মাশায়েখ মায়েল হতেন না। অর্থাৎ তারা প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তো সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। মধ্যবর্তী কোন বৈঠক করতেন না।

(মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩৯৪)

বসে তারপর দাঁড়ানোর দলীল:

এর বিপরীত কোন কোন হাদীসে দ্বিতীয় সিজদার পর বসে, এরপর দাঁড়ানোর কথাও এসেছে। যেমন:–

১. **عن أبي قلابة قال: جائنا أبو سليمان مالك بن الحويريث إلي مسجدنا ----- و ذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخرة فى الركعة الأولى قعد ثم قام-**

মালিক ইবনুল হুওয়াইরিছ রা., রাসূল সা. এর নামায পড়ে দেখালেন। তিনি প্রথম রাক'আতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠালেন, প্রথমে বসলেন এরপর দাঁড়িয়ে গেলেন।

(আবু দাউদ ১/১২২)

২. عن مالك بن الحويرث أنه رأييه النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا -

মালিক ইবনে হুওয়াইরিছ রা. থেকে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে– তিনি দেখেছেন যে, রাসূল সা. বিজোড় রাকাতে (প্রথম ও তৃতীয়) বসেছেন। এরপর দাঁড়িয়েছেন। (আবু দাউদ-১/১২২, বুখারী-১/১১৩)

ইমামে আযমের সমাধানঃ

উপরের আলোচনার পর একথা স্পষ্ট যে, প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতে সিজদার পর বৈঠক সম্পর্কে হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী। এ বিরোধের নিরসন ইজতিহাদ ব্যতীত সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমরা ইমামে আযম আবু হানিফার রহ. ইজতিহাদের উপর নির্ভর করি। তিনি বলেন– প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতের দ্বিতীয় সিজদার পর দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতের জন্য সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়াই সুন্নত। তবে অপারগতাবশতঃ বসে এরপর দাঁড়ালেও সমস্যা নেই। যেমন দ্বিতীয় প্রকার হাদীসে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যবান, বৃদ্ধ কিংবা অসুস্থ লোকেরা এমনটাই করেন।

রাসূল সা. এর বসে এরপর দাঁড়ানোর ব্যাখ্যাঃ

কোন কোন হাদীসে এসেছে রাসূল সা. বসতেন। এরপর দাঁড়াতেন । এটা ঐ সময়ের কথা যখন রাসূল সা. স্বাস্থবান হয়ে গিয়েছিলেন। শরীরে কিছুটা দুর্বলতাও এসে গিয়েছিল। এ সময় রাসূল সা. এর আমল প্রথম আমল থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম হয়ে গিয়েছিল। তবে তা ওযরের কারণে। এর প্রমাণ হল–

১. মুয়াবিয়া রা. থেকে বর্ণিত- রাসূল সা. বলেন– রুকু সিজদায় আমার থেকে অগ্রগামী হয়োনা। কেননা أنى قد بدنت আমার শরীর ভারী হয়ে গেছে।

২. عن أبي قلادة قال: جائنا أبو سليمان مالك بن الحويريث إلى مسجدنا فقال: و الله إنى لأصلى وما أريد الصلاة لكنى أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى قال: (أيوب) قلت: لأبى قلابة كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعنى عمرو بن سلمة إمامهم الخ-

আবু কিলাবা থেকে বর্ণিত মালিক ইবনে হুওয়াইরিছ- রাসূল সা. এর নামায পড়ে দেখালেন। তিনি নামাযে সিজদা থেকে উঠে সামান্য বসলেন। আবু কিলাবা বলেন– তিনি আমাদের বৃদ্ধ আমর ইবনে সালমার মত নামায পড়লেন। (আবু দাউদ- ১/১২২, বুখারী-১/১১৩)

৩. قال: أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه كان يقعد فى الثالثة او الرابعة-

আইয়ূব সাখতিয়ানী রহ. বলেন– আমর ইবনে সালমা নামাযে এমন একটি কাজ করতেন, আমি অন্য কাউকে অনুরূপ কাজ করতে দেখিনি। তিনি তৃতীয় রাকাআতের শেষে বা চতুর্থ রাকাআতের শুরুতে সামান্য বসতেন। (বুখারী ১/১১৩)

নোটঃ বুঝা গেল রাসূল সা. এর বসা ওযরের কারণে ছিল। সুন্নত কিংবা শরয়ী হুকুম হিসাবে নয়। আর আইয়ূব সাখতিয়ানী রাসূল সা. এর ওযরের সময়ের নামাযের নকশাই পেশ করেছেন।

সতেরতম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কারঃ

আহলে হাদীস বন্ধুদের প্রতি আহ্বান হল– অত্র মাসআলার হাদীসগুলো সাংঘর্ষিক। তাদের নিকট তাকলীদ হল শিরক। আর দ্বীনি বিষয়ে কিয়াস হল শয়তানের কাজ। সুতরাং তারা অবশ্যই শিরক ও শয়তানী কাজ থেকে বিরত থাকবেন। আর হাদীসগুলোর বিরোধ মিটানোর জন্য স্পষ্ট বক্তব্যমূলক হাদীস পেশ করবেন। যদি তারা–

১. উক্ত বিরোধের সমাধান কল্পে রাসূল সা. এর শুধুমাত্র এমন একটি হাদীসে সহীহ, সরীহ, মারফু, মুত্তাসিল পেশ করতে সক্ষম হয় যাতে রাসূল সা. উক্ত বিরোধের স্পষ্ট সমাধান দিয়েছেন এবং
২. উক্ত হাদীসের সিহ্যত এবং আমাদের হাদীস গুলোর যুয়ফ উম্মতের কারো মত ও উক্তির তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে সক্ষম হয়।

আমরা তাদেরকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

এক আহলে হাদীস আলেমের ধোকাঃ

আহলে হাদীসের এক আলেম খালেদ গিরজাখী সাহেব লিখেন– কিছু মানুষ জালসায়ে ইসতিরাহাত (প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতের দ্বিতীয় সিজদার পরের বৈঠক) মানতে নারাজ। অথচ এটা প্রমাণিত সুন্নত। ফিকহ হানাফীতে এটাকে সুন্নত স্বীকার করা হয়েছে।

(হেদায়া– ১/৩৮৩, সলাতুন্নবী, ১৭৪)

আঠারতম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুরা যদি–

১. কোন প্রকার তাকলীদ ও তাবীল ব্যতীত 'জলাসায়ে ইসতিরাহাত' সুন্নত হওয়াটা প্রমাণ করতে পারে এবং
২. জলসায়ে ইসতিরাহাত– সুন্নত হওয়া সংক্রান্ত হেদায়ার আরবী ইবারত লিখে দিতে পারে-

আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব। বন্ধু! কোরআন-হাদীসের নামে মানুষকে আর কতকাল ধোকা দিবে?

এগারতম মাসআলা:

যমীনে টেক না লাগিয়ে সিজদা থেকে দাঁড়ানো সুন্নত

প্রশ্ন: সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সুন্নত তরীকা কী?

উত্তর: যমীনের উপর টেক না লাগিয়ে দাঁড়ানেই সুন্নত। টেক লাগানো সুন্নত পরিপন্থী। তবে টেক লাগিয়ে দাঁড়ানোর পক্ষেও হাদীস রয়েছে। উভয় পক্ষের হাদীসসমূহ নিম্নরূপ–

টেক না লাগিয়ে দাঁড়ানো সুন্নত হওয়ার দলীল:

১. **عن نافع عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض فى الصلاة-**

নাফে' থেকে বর্ণিত, ইবনে ওমর রা. বলেন– রাসূল সা. নামাযে সিজদা থেকে উঠার সময় উভয় হাত যমীনে টেক লাগিয়ে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ ১/১৪২)

২. **عن وائل بن حجر قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه و إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه -**

অয়েল ইবনে হুজর রা. বলেন– আমি রাসূল সা. কে দেখেছি তিনি সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে হাত উঠাতেন। এরপর হাটু।

(আবু দাউদ ১/১২২, তিরমিযী ১/৩৬, নাসায়ী ১/১৬৫)

টেক লাগিয়ে দাঁড়ানোর হাদীস:

কোন কোন হাদীসে যমীনের উপর টেক লাগানোর কথাও রয়েছে। যেমন-

عن أبى قلابة قال: جائنا مالك بن الحويريث فصلى بنا فى مسجدنا هذا فقال: إنى لأصلى بكم و ما أريد الصلاة لكنى أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى عليه و سلم يصلى قال: (أيوب) فقلت لإبى قلابة و كيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعنى عمرو بن سلمة، قال: أيوب و كان ذلك الشيخ يتم التكبير و إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس و اعتمد على الأرض ثم قام-

আবু কিলাবা বলেন-মালিক ইবনে হুওয়াইরিছ-আমাদের মসজিদে আসলেন এবং আমাদেরকে নামায পড়ালেন। নামাযে শেষে বললেন– আমি তোমাদেরকে নামায পড়ালাম। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য নামায পড়ানো নয়। বরং রাসূল সা. কিভাবে নামায পড়তেন, তা দেখানো।

আইয়ূব সাখতিয়ানী বলেন– মালিক ইবনে হুওয়াইরিছ কিভাবে নামায পড়েছিলেন? আবু কিলাবা উত্তরে বললেন- আমাদের এই বৃদ্ধ আমর ইবনে সালমার মত। আইয়ুব সাখতিয়ানী বলেন, আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম- এই বৃদ্ধ যখন দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, বসে যেতেন এবং যমীনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

এ হাদীসটির উপর ইমাম বুখারী রহ. **باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة** ('রাক'আত শেষে দাঁড়ানোর সময় যমীনের উপর কিভাবে ভর দিবে' এর পরিচ্ছেদ) নামে শিরোনাম দিয়েছেন। (বুখারী-১/১১৪)

সাহাবায়ে কেরামের আমল:

এ আলোচনার দ্বারা অত্র মাসআলায় হাদীসগুলোর মাঝে বিরোধ স্পষ্ট। এক্ষেত্রে কায়দা হল– সাহাবায়ে কেরামের আমলের আলোকে সমাধান খোঁজা। সাহাবা ও তাবেয়ীনের আমল থেকে নিজেদের আমলের পথ বের করা । নিম্নে তাদের কতিপয় আমল তুলে ধরা হল–

১. আলী রা. বলেন– ফরয নামাযে সুন্নত হল– ব্যক্তি যখন প্রথম দু'রাকাআতে দাঁড়াবে, হাতে যমীনের উপর টেক লাগাবে না। হ্যাঁ যদি সে দুর্বল হয়, টেক লাগানো ব্যতীত দাঁড়ানোর ক্ষমতা না রাখে। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা- ৪৩২)

২. মুহাম্মদ ইবনে সায়র (সিজদা থেকে উঠার সময়) টেক লাগানো অপছন্দ করতেন।

৩. ইব্রাহীম নখয়ী রহ. এটাকে মাকরূহ মনে করতেন। কিন্তু মুসল্লী অত্যধিক বৃদ্ধ বা অসুস্থ হলে। (অর্থাৎ তখন অপন্দ করতেন না।) (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা– ৪৩২)

সমাধানঃ

উল্লিখিত আছার ও উক্তির আলোকে স্পষ্ট হয় যে, সুন্নত তরীকা হল টেক না লাগানো। তবে অপারগ হলে যেমন- বৃদ্ধ, অসুস্থ, অধিক স্বাস্থবান, যাদের জন্য টেক লাগানো ব্যতীত দাঁড়ানো কষ্টকর। তাদের জন্য টেক লাগানোর অবকাশ রয়েছে।

উনিশতম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কারঃ

আহলে হাদীস বন্ধুদের নিকট তাকলীদ হল শিরক আর কেয়াস হল শয়তানের কাজ। সুতরাং এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থেকে সহীহ, সরীহ হাদীসের আলোকে সমাধান পেশ করা তাদের কর্তব্য। সুতরাং যদি তারা–

১. রাসূল সা. এর সহীহ, সরীহ, মুত্তাসিল, মারফু হাদীস দ্বারা উক্ত মাসআলার সমাধান পেশ করতে পারেন এবং

২. উক্ত হাদীসের সিহ্যত এবং আমাদের হাদীসের যুয়ফ উম্মতের কারো তাকলীদ করা ব্যতীত প্রমাণ করতে পারেন-

আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

বারতম মাসআলাঃ তাশাহুদে বসার সুন্নত তরীকা

প্রশ্নঃ তাশাহুদে বসার সুন্নত তরীকা কী?

উত্তরঃ মধ্যবর্তী বৈঠক হোক কিংবা শেষ বৈঠক, বসার সুন্নত তরীকা হল ডান পা খাড়া রাখবে, বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসবে। তবে অন্যভাবে বসার হাদীসও রয়েছে। দেখুন–

প্রথম পদ্ধতির হাদীসঃ

১. **عن وائل بن حجر قال: قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى عليه و سلم فلما جلس يعنى للتشهد افترش رجله اليسرى و وضع يده اليسرى يعنى على فخذه اليسرى و نصب رجله اليمنى- قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح- و العمل عليه عند أكثر اهل العلم-**

অয়েল ইবনে হুজর রা. বলেন– একদা আমি মদীনায় আসলাম তো মনে মনে সংকল্প করলাম– আমি অবশ্যই রাসূল সা. এর নামায দেখব। দেখলাম তিনি যখন তাশাহুদের জন্য বসলেন– বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসলেন্ আর ডান পা খাড়া রাখলেন।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান- সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন এবং বলেছেন অধিকাংশ আহলে ইলমের আমল এ পদ্ধতির উপরেই। (তিরমিযী ১/৬৫)

২. **عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى و تنصب اليمنى-**

আব্দুল্লাহ তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– সুন্নত হল (তাশাহুদের বৈঠকে) ডান পা খাড়া রাখবে। আর আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে রাখবে এবং বাম পায়ের উপর বসবে। (সুনানে নাসায়ী ১/১৩০)

৩. **عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى عليه و سلم ....و كان يفرش رجله اليسرى و ينصب رجله اليمنى -**

আয়শা রা. বলেন– রাসূল সা. বাম পা বিছিয়ে দিতেন। আর ডান পা খাড়া রাখতেন। (মুসলিম শরীফ ১/১৯৪)

৪. আনাস রা. বলেন– রাসূল সা. পায়ের পাতায় বা তাওয়ারুক করে তথা এক পা বা উভয় পা বাম দিকে বের করে দিয়ে যমীনের উপর বসতে নিষেধ করেছেন।

(সুনানে কুবরা, বায়হাকী ১/১২০, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ২/৮৬)

৫. সামুরা থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. পায়ের পাতায় কিংবা তাওয়াররুক তথা এক পা বা উভয় পা বাম দিকে বের করে দিয়ে যমীনের উপর বসতে নিষেধ করেছেন। (মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ২/৮৬)

দ্বিতীয় পদ্ধতির হাদীস:

বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ শরীফে আবু হুমাইদ সায়েদী থেকে বর্ণিত হাদীসে তাওয়ারুক এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০ জন সাহাবী স্বাক্ষ্য দিয়েছেন যে, রাসূল সা. বসার ক্ষেত্রে তাওয়াররুক পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

সাহাবায়ে কেরামের আমল:

তাশাহুদের বৈঠক পদ্ধতি নিয়ে হাদীস বিরোধপূর্ণ বিধায় আমরা সাহাবায়ে কেরামের আমলের অনুসরণ করব। নিম্নে কয়েকজন সাহাবার আমল উল্লেখ করা হল–

১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন– সুন্নত হল বাম পা বিছিয়ে দিবে আর ডান খাড়া করে রাখবে। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩১৮)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন– নামাযে গোড়ালীর উপর নিতম্ব রেখে বসবে। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩১৯)

৩. কা'ব রা. বলেন– তাশাহুদে বাম পা বিছিয়ে দাও। এতে তোমার নামায শুদ্ধ হবে এবং কোমর সোজা থাকবে।

(মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩১৬)

সমাধান:

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, তাশাহুদে বসার সুন্নত তরীকা হল– ডান পা খাড়া করে রাখবে। বাম পা বিছিয়ে দিবে। আর তাওয়াররুক ওযরের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। প্রবল সম্ভাবনা এটাই যে,

রাসূল সা. ওযর এবং অপারগতার কারণেই তাওয়াররুক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আর একথা তো স্পষ্ট যে, ওযরের সময় বসার পদ্ধতি শুধু তাওয়াররুকের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং ওযর অনুযায়ী যেভাবে বসা সম্ভব হয়, সেভাবেই বসবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর আমল থেকে এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع فى الصلاة إذا جلس ففعلته و أنا يومئذ حديث السن فنهانى عبد الله بن عمر و قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى و تثنى اليسرى فقلت: إنك تفعل ذلك فقال: إن رجلاى لا تحملانى-

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের রা. এর সুযোগ্য সন্তান আব্দুল্লাহ তার পিতাকে দেখলেন তিনি নামাযে আসন পেতে বসেন। আব্দুল্লাহ বলেন– তাকে এভাবে বসতে দেখে আমিও আসন পেতে বসলাম। এসময় আমি অল্প বয়স্ক ছিলাম। এ ভাবে বসতে দেখে আমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আমাকে নিষেধ করলেন।

বললেন– (বৎস!) নামাযে বসার একমাত্র সুন্নত তরীকা হল– তুমি তোমার ডান পা খাড়া রাখবে। আর বাম পা ঘুরিয়ে (বিছিয়ে) বসবে।

আব্দুল্লাহ বলেন– আমি বললাম– আব্বাজী! আপনি তো আসন পেতে বসেন। ইবনে ওমর রা. বললেন– আমার পা আমার ওযন রাখতে পারে না। (অর্থাৎ আমার এভাবে বসা ওযরের কারণে।) (বুখারী ১/১১৪)

বিশতম চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কার:

আহলে হাদীস বন্ধুদের প্রতি আহ্বান হল– তারা কোন প্রকার তাকলীদ ও তাবীলের আশ্রয় না নিয়ে রাসূল সা. এর স্পষ্ট হাদীস দিয়ে উল্লিখিত বিরোধের সমাধান প্রদান করবেন। যদি তারা–

১. রাসূল সা. এর হাদীসে সহীহ, সরীহ, মারফু, মুত্তাসিল দ্বারা উক্ত বিরোধের নিরসন করতে পারেন, এবং

২. উক্ত হাদীসের সিহ্হত উম্মতের কারো মতের তাকলীদ ব্যতীত প্রমাণ করতে পারেন,

আমরা তাদেরকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করব।

বন্ধু! যদি নেই পার, হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী সব মুকাল্লিদীনকে মুশরিক– দোযখী বলার বদ্যাভ্যাস ও বদযুবানী থেকে বিরত থাক।

আহলে হাদীসের সাহচর্যের অশুভ পরিণতি

আহলে হাদীসের একটি দল– হজ্জের উদ্দেশ্য জাহাযে আরোহন করল। ঐ দিন সন্ধ্যায় তারা মাগরিবের নামাযের ব্যবস্থা করল। আমিও (হাবীবুর রহমান শেরওয়ানী) তাদের সাথে জামাতে শরীক হলাম। এরপর অনবরত বাতাস ও বৃষ্টি চলছিল। এশার নামায তারা আমার রুমে এসে আদায় করল। অগত্যা আমারও তাদের সাথে দ্বিতীয় বার জামাতে শরীক হতে হল। সকাল বেলা এর অনাকাঙ্খিত প্রভাব অনুভব করলাম। মন বিষন্ন ও সংকুচিত হয়ে গেল। কলবের কাঠিন্য ও উদাসীনতায় ঘাবড়ে গেলাম। তখন আমি জুযবুল কুলুব কিতাবটি পড়তে লাগলাম। আল হামদুল্লিাহ এর বরকতে অন্তর নির্মল হয়ে গেল। কাঠিন্য দূর হয়ে তারল্য অনুভব করলাম। এরপর আর আমি তাদের সাথে নামায পড়িনি।

(সফরনামায়ে হজ্জ, নওয়াব সদর ইয়ার জংগ, হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী পৃষ্ঠা:১২)

ইবরত:

যারা আহলে হাদীসের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। হৃদ্যিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। তাদের মজলিশ- মাহফিলে যাতায়াত করে, তাদের মসজিদে নামায পড়ে, তাদের জন্য বর্ণিত ঘটনায় দৃষ্টিদানকারী ইবরত রয়েছে।

অনুবাদ সমাপ্ত
২২.০২.২০১২ইং

আহলে হাদীসের প্রতি
পাল্টা চ্যালেঞ্জ

মূল
শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রহ.
(মৃত্যু: ১৩৩৯হি.-১৯২০ইং)

অনুবাদ
রুহুল্লাহ নোমানী

লিখক ও কিতাব সম্পর্কে

শায়খুল হিন্দ রহ. এর ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট, ইলম, তাকওয়া, রচনা, পাঠদান এবং উপমহাদেশের রাজনীতিতে তাঁর অবদান ইত্যাদির কোনটাই পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেনা। তিনি সব ক্ষেত্রেই ছিলেন সব্যসাচী। ছিলেন সব ময়দানেরই শাহ-সওয়ার। এমন দুর্লভ প্রতিভা সম্পর্কে বলার সাধ্য যেমন নেই, প্রয়োজনও নেই। দরকার নেই তাঁর 'আদিল্লায়ে কামেলার' গুণকীর্তনেরও। তবে 'আহলে হাদীসের প্রতি পাল্টা চ্যালেঞ্জ' নামক সংকলনটি প্রশ্নাতীত নয়।

১২৯০ হিজরীতে আহলে হাদীসের স্বঘোষিত মুজতাহিদ মাওলানা হুসাইন বাটালভী সাহেব আহনাফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। বেচারার আত্মবিশ্বাসের (!) প্রশংসা করতে হয়। তিনি দলিল প্রতি ১০ রুপি প্রদানের ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু বেচারা হয়ত কল্পনাও করেননি, নিজ হাতে বিছানো কাঁটা তার পায়েই বিদ্ধ হবে। তাই শেষতক তাকে রণে ভঙ্গে দিতে হয়েছিল।

মহান মুজতাহিদ (!)বাটালভী সাহেবের ইজতেহাদসমূহ হানাফী মাযহাবে মানা হয় না। তাই রাগে- ক্ষোভে ফায়ার হয়ে গেলেন।প্রতিজ্ঞা করলেন এদেরকে উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে। হয়তবা ধারণাও করেছিলেন- দলীল তো সব আমার পকেটে। এত আগে এসে আবু হানাফী দলীল পাবে কাথায়? চোরের পা ধোয়া আর তাহাজ্জুদ গুযারের উযুর করার ঘটনার মত।

এদিকে শায়খুল হিন্দ তখন টগবগে যুবক। তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। এমন জওয়াব দিলেন যা দাঁত কোথায়? মাড়িও অদৃশ্য করে দিল। সাথে দিলেন গুণে গুণে দশটির বদলে দশটি পাটকেল । তারা উহ-আহ করল কিন্তু ঠিকই বুঝে নিল কত ধানে কত চাল। আমরা এখানে ১১৪ বছর আগের সেই পাটকেলগুলো হাজির করেছি। হয়তবা তারা আত্মসমালোচনা করবেন। হয়তবা এ ফিৎনার আগুন নির্বাপিত হবে।

শায়খুল হিন্দ রহ. এর মূল কিতাব 'আদিল্লায়ে কামেলা' ব্যাখ্যাসহ 'তোহফায়ে আহলে হাদীস' নামে অনুবাদ হয়েছে। 'আদিল্লায়ে কামেলা' সম্পর্কে অনুবাদক মুফতি ফজলুদ্দীন শিবলী সাহেব বলেন-

বক্ষমান বইয়ের প্রতিটি পাতায় পাঠক দেখবেন কিশোর শায়খের মধুর আঘাত কতটা নিষ্ঠুর। কলমের খোচা কতটা ক্ষুরধার। যুক্তি ও কথার মারপ্যাঁচ কতটা ধারাল। দলীল ও প্রমাণের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা উদারনৈতিক।

আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দিক। শায়খুল হিন্দ রহ. কে উঁচু মর্যাদা দান করুক। আমীন।

বিনীত
রুহুল্লাহ নোমনী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আহলে হাদীসের লিফলেট ও চ্যালেঞ্জ

আমি- বিলিয়াওয়ালী নিবাসী মৌলভী আবদুল আযীয সাহেব, মৌলভী মুহাম্মদ সাহেব এবং মৌলভী ইসমাঈল সাহেব এবং তাদের ছাত্র-শিষ্য যেমন মিঁয়া গোলাম মোহাম্মদ সাহেব হুশিয়ারপুরী, মিঁয়া নিযামুদ্দীন সাহেব, মিঁয়া আবদুর রহমান সাহেব প্রমুখসহ পাঞ্জাব ও গোটা ভারতবর্ষের হানাফীদের সাথে প্রাকাশ্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যদি তাদের কেউ নিম্ন বর্ণিত মসআলাগুলোর ব্যাপারে কোরআনের আয়াত অথবা হাদীসে সহীহ- যার ব্যাপারে কারো মতভেদ নেই, যা সুস্পষ্ট অর্থবহ এবং উদ্দিষ্ট মাসআলার প্রতি নিশ্চিত ইঙ্গিতবহ- পেশ করতে পারে, তাহলে তাকে প্রতি আয়াত ও প্রতি হাদীসের বিনিময়ে ১০ রুপি করে পুরস্কার প্রদান করব।(মাসআলাগুলো হল-)

১.রাসূল সা. রুকুতে গমন কালে এবং রুকু থেকে মাথা উত্তোলন কালে রফয়ে ইয়াদাইন না করা।
২. রাসূল সা. নামাযে আস্তে "আমীন" বলা।
৩. রাসূল সা. নামাযে নাভির নীচে হাত বাঁধা।
৪. রাসূল সা. নামাযে মুক্তাদীকে সূরা ফতিহা পড়তে নিষেধ করা।
৫. রাসূল সা. অথবা আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যক্তির উপর ইমাম চতুষ্টয়ের কোন একজনের তাকলীদ ওয়াজিব করা।
৬. দ্বিতীয় মিছলের শেষ পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকা।
৭. সাধারণ মুসলমানের ঈমান এবং পয়গাম্বর ও জিবরাইল আ. এর ঈমান সমান হওয়া।
৮. বিচারকের রায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কার্যকর হওয়া।

নোটঃ উদাহরণস্বরূপ কোন অসৎ ব্যক্তি কারো স্ত্রী সম্পর্কে দাবী করল যে, সে আমার স্ত্রী এবং আদালতে মিথ্যা সাক্ষী পেশ করে মামলা জিতে নিল। কাজীর ফয়সালা হিসাবে উক্ত মহিলা তার স্ত্রী বলে গণ্য হবে এবং তার সাথে সহবাস করাও বৈধ হবে।

৯. যদি কোন ব্যক্তি চির হারাম কোন মহিলাকে (যেমন- মা-বোন) বিবাহ করে এবং তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর শরয়ী হদ (দন্ডবিধি) যা কোরআন-হাদীসে বর্ণিত আছে কার্যকর না হওয়া।

১০. দশ বাই দশ হিসাবে (তথা বর্গক্ষেত্র কিংবা আয়াতক্ষেত্র হিসাবে ১০০ হাত দ্বারা) 'মায়ে কাছীর' (অধিক পানি, যা নাপাকী পড়ার দ্বারা নাপাক হয়না) এর পরিমাণ নির্ধারণ করা।

বিঃ দ্রঃ এ মাসআলাসমূহের হাদীস তালাশ করার জন্য আমি তাদেরকে তাদের চাহিদা মাফিক অবকাশ দিচ্ছি। যত সময় চায় নিতে পারবে। এমনকি তাদের কোন মাযহাবী ভাইয়ের সহয়োগিতা নিতে চাইলে, সে সুযোগও থাকবে।

প্রচারে,
আবু সাঈদ মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী লাহোরী
১২৯০ হিজরী

আশ্চর্যঃ

১. পুরো লিফলেটে একটি বারের জন্যও রাসূল সা. এর শানে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' লিখা হয়নি। এমনকি সংক্ষেপেও না। এ হল আহলে হাদীসের নবীপ্রেম; রাসুল সা. এর সাথে আদবের দৃষ্টান্ত।

২. আরবীতে দশ এর প্রতিশব্দ হল **عشر** এবং দশম বুঝানোর জন্য **عاشر** শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এতবড় চ্যালেঞ্জের প্রচারক সাহেব লিফলেটে দশম বুঝানোর জন্যও **عشر** শব্দটি লিখে দিয়েছেন। এ হল তাদের আরবী জ্ঞানের দৌরাত্ম।

(তাসহীলে আদিল্লায়ে কামেলা, পৃষ্ঠা নং-১২)

আহলে হাদীস কেন লিফলেটবাজী করেছিল?

এ সম্পর্কে মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেব রহ. (মুহতামিম- জামিয়াতুল উলুম আল-ইসলামীয়া, বিন্নুরী টাউন করাচী) তাঁর حضرت شیخ الہند کا علمی مقام اور انکی تصانیف নামক গ্রন্থে বলেন-

মাওলানা হুসাইন সাহেব বাটালভী - যাকে অকীলে আহলে হাদীস বলা হয়- ইমামগণের অনুসারী, বিশেষত: হানাফীদের বিরুদ্ধে খুবই স্বোচ্ছার ছিলেন। তিনি হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ মাসআলাই কিয়াসপ্রসূত এবং হাদীসবিরুদ্ধ মনে করতেন। এ জন্য হিম্মত করে ইমাম আবু হানীফার এমন দশটি মাসআলা নির্বাচন করলেন-তার ধরণা মতে যা সম্পূর্ণ দলীলহীন বরং দলীল বিরোধী। এরপর প্রফুল্ল মনে পাঞ্জাবসহ গোটা ভারতবর্ষের হানাফী আলেমগণ বরাবর চ্যালেঞ্জ দিয়ে লিফলেট বিতরণ করলেন। ঘোষণা করলেন- যদি কেউ এসব মাসআলার পক্ষে কোন আয়াত বা হাদীসে সহীহ- যা উদ্দিষ্ট মাসআলার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিতবহ- পেশ করতে পারে, তাকে প্রত্যেক আয়াত ও হাদীসের বিনিময়ে দশ রুপি করে পুরস্কার দেয়া হবে।

(তাসহীলে আদিল্লায়ে কামেলা, পৃষ্ঠা নং- ১২)

মাওলানা বাটালভী সাহেবের-লিফলেট বিতরণ করে হানাফীদের বিরুদ্ধে শুধু অহংকার মিশ্রিত যুদ্ধ ঘোষণা করাই উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এর অন্ত রালে ইমাম আবু হানীফা রহ. কে অজ্ঞ এবং ভ্রান্ত সাব্যস্ত করার অসৎ অভিপ্রায়ও লুকায়িত ছিল।তিনি জন সাধারণকে ধারণা দিতে চেয়েছিলেন- আবু হানীফা রহ. এর মাসআলা- মাসায়িল এমন দলীলহীন যে পুরো দেশের সব হানাফীরা মিলেও এ সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। পারলে তো তারা যুগ শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ (!) মাওলানা হুসাইন বাটালভীর সু-মহান দরবারে পুরস্কারের উপযুক্ত গণ্য হতেন।

বাস্তব কথা হলো- এ চ্যালেঞ্জের মাঝে ইমামে আযমের অজ্ঞতা প্রমাণের খাহেশ এবং ওলামায়ে আহনাফের লাঞ্চনা নিহিত ছিল। সাথে সাথে এটা ছিল ইংরেজদের হীন কৌশল- 'দ্বন্দ্বে জড়াও, শাসন চালাও' নীতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। কেননা এ চ্যালেঞ্জের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এটাই ছিল যে, দেশ জুড়ে ফিৎনার আগুন জলে উঠবে এবং গলিতে গলিতে হানাফী- অহাবী (আহলে হাদীস) লড়াই শুরু হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত- পৃ: ১৪)

শায়খুল হিন্দ রহ. কেন জওয়াব দিলেন? কেমন জওয়াব দিলেন?

মাওলানা সায়্যেদ আসগর হুসাইন সাহেব রহ. حیات شیخ الہند গ্রন্থে লিখেন-

এ লিফলেট দেওবন্দেও পৌঁছলো। এমন শক্ত হামলা সকল হানাফীর নিকটেই ভারী মনে হয়েছিল এবং পাঞ্জাবের একজন আলেম আপন সাধ্যানুযায়ী এর জওয়াবও দিয়েছিলেন। শায়খুল হিন্দ রহ. এবং তাঁর মুহতরাম উস্তাদ কাসেম নানুতুবী রহ. এর নিকটও চ্যালেঞ্জের এ অগ্রাহ্য পদ্ধতি ও নিন্দাযোগ্য অহমিকা অত্যন্ত অপছন্দ হলো। সাথে সাথে এটা ইমাম কুল শিরোমনি আবু হানীফা রহ.কে অপমান প্রত্যাশার বাস্তব নমুনা ছিল। তাই শায়খুল হিন্দ রহ. উস্তাদে মুহতারামের ইজাযত ও ইশারাপ্রাপ্ত হয়ে কলম ধরলেন। সংক্ষিপ্ত অথচ এমন শক্তিশালী জওয়াব দিলেন যে, প্রতিপক্ষের কলমই ভেঙ্গে গেল। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪)

অহেতুক লিফলেটবাজী করে মাওলানা হুসাইন সাহেব মূলতঃ রুচিহীন দু:সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। শায়খুল হিন্দ রহ. 'আদিল্লায়ে কামেলার' ভূমিকায় লিখেন-

লিফলেট দেখে আশ্চর্য হয়েছি। মাওলানা সাহেবের যদি ছোট মুখে বড় কথা বলারই ইচ্ছা ছিল, তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. পর্যন্ত থামলেন কেন? অগ্রসর হওয়ার পথ তো বাকি ছিল। সাহাবা রা. ও রাসূল সা. থেকে একটু অগ্রসর হয়ে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন, কামও বড় হত; নামও বেশি হত। আপনি তো দশ রুপির লোভ দেখালেন। আমরা আপনার নিকট শুধু বুঝ-বিবেচনা ও ইনসাফের প্রত্যাশা করছি। সততা প্রদর্শন করুন। যদি ব্যর্থ হন আমরাও আছি। আপনার সাথেই থাকব। শেষতক মামলাও হবে। বিচার দিবসে আল্লাহ-রাসূলের দরবারে এর নিষ্পত্তি হবে। জনাব! উগ্রতায় বিশ্বাসী নই বিধায় চুপচাপ ছিলাম। কিন্তু ময়দান খালি পেয়ে আপনি গোলের নেশায় মেতেছেন। ঔদ্ধত্যের জোর এতখানি যে, আপনাকে লিফলেটবাজীও করতে হলো। এক হাত দু'হাত হয়ে আপনার লিফলেট যখন দেওবন্দেও পৌঁছল, বলুন! কিভাবে নিশ্চুপ থাকি।

শায়খুল হিন্দের পাল্টা চ্যালেঞ্জ

পাল্টা চ্যালেঞ্জ- ১ঃ রফয়ে ইয়াদাইন

আপনি আমাদের থেকে রুকুতে গমনকালে এবং রুকু থেকে উঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইন না করার ব্যাপারে বুখারী-মুসলিমের সহীহ হাদীস তলব করেছেন। সাথে এ শর্তও জুড়ে দিয়েছেন যে, হাদীসটি মাসআলার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট অর্থবহ হতে হবে। কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় নেয়া যাবে না।

আমরা আপনার নিকট সব সময় রফয়ে ইয়াদাইন করার দলীল তলব করছি। আপনার হাদীসটিও কিন্তু মুত্তাফাক আলাই, সুস্পষ্ট অর্থবহ হতে হবে। যদি থাকে পেশ করুন। দশের বদলে বিশ নিয়ে যান। আর যদি না পারেন? একটু শরম হলেও করবেন। আরো সহজ করে দিচ্ছি। রাসূল সা. সারাজীবন রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন, এ কথা প্রমাণ করার দরকার নেই। জীবনের শেষ নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন, এটুকু হলেও প্রমাণ করুন। ১০ এর বদলে ২০ দিব। তবে দলীল কিন্তু আগের মতই সরীহ, সহীহ, মুত্তাফাক আলাই হতে হবে। এও যদি না পারেন মুখ দেখাবেন কোন শরমে?

কী বলেন? আরো সহজ করে দিতে হবে? ঠিক আছে। সহীহ হতে হবেনা। মুত্তাফাক আলাই তো না...ই। এবার হলেও একটু হিম্মত করুন। কী....? তা ... ও পারবেন না। তওবা! তওবা! এই বুঝি আহলে হাদীস? আপনিই বলেন-এই যদি হয় আপনাদের অবস্থা তাহলে হাদীসের প্রকৃত অনুসারী কারা? আপনারা না আমরা?

পাল্টা চ্যালেঞ্জ-২: জোরে আমীন বলা

আপনি আমাদের নিকট আস্তে আমীন বলার হাদীসে সহীহ, সরীহ তলব করেছেন, যা মুত্তাফাক আলাই .. ও হতে হবে। ঠিক আছে। একই দাবী আমাদেরও। আমরাও আপনার নিকট রাসূল সা. এর সর্বদা জোরে আমীন বলার হাদীস তলব করছি। এ ক্ষেত্রেও কিন্তু সহীহ, সরীহ, মুত্তাফাক আলাই হওয়ার শর্ত রয়েছে। যদি পারেন, নিয়ে আসুন। দশের বদলে বিশ দিব। না পারলে কিন্তু এসব বুলি আর কোন

দিন আওড়াতে পারবেন না। কী বলেন! একটু সহজ করলে ভাল হয়? ঠিক আছে সহজ করা হল। এটুকু প্রমাণ করুন যে, রাসূল সা. জীবনের শেষ নামাযে আমীন জোরে বলেছেন। আর বিনিময়? একদম কমাব না। দশের বদলে বিশই দিব। কিন্তু না পারলে আপনাকে বলতে হবে হাদীসের প্রকৃত অনুসারী কারা? আমরা না আপনারা?

পাল্টা চ্যালেঞ্জ-৩: নাভির নীচে হাত বাঁধা

আপনি আমাদের নিকট নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীসে সহীহ, সরীহ, মুত্তাফাক আলাই দাবী করেছেন। আচ্ছা। আমারাও আপনার নিকট একই ধরণের হাদীস দাবী করছি। হাদীস সহীহ, সরীহ, মুত্তাফাক আলাই দিয়ে আপনাদের দাবীগুলো প্রমাণ করুন। কোন হাদীসে আছে যেখানে মন চায় সেখানেই হাত বাঁধা যাবে? কোন হাদীসে নাভির নীচে হাত বাঁধতে নিষেধ করা হয়েছে এবং অন্য অঙ্গের উপর সর্বদা হাত বাঁধার জন্য বলা হয়েছে? বেশী নয় শুধু একটি হাদীস দেখান। আর টাকা? আগের মতই দশের বদলে বিশ। না পারলে কিন্তু মুখটায় একটু তালা মেরে রাখবেন। ও মনে করেছেন হানাফীরা শুধু উড়ো কথা বলে বেড়ায়? এজন্যই এত হাম্ভিদম্ভি? একটু কষ্ট করে মোল্লা হাশেম সিন্ধী এবং মোল্লা কায়েম সিন্ধীর রেসালা দু'টি পড়ে নিন। এ মাসআলায় হানাফীদের পক্ষে সহীহ ও মারফু হাদীস যেমন রয়েছে, হাদীসে মাওকুফও আছে।

পাল্ট চ্যালেঞ্জ-৪: ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়া

আপনি তো আমাদের নিকট এমন হাদীস চেয়েছেন যাতে মুক্তাদীকে কিরাআত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা আপনার নিকট এমন হাদীস চাচ্ছি যাতে মুক্তাদীর উপর কিরাআত ওয়াজিব করা হয়েছে। বুঝেছেন তো হাদীসটি কেমন হতে হবে? সরীহ, সহীহ। সহীহও কিন্তু সাধারণ নয়। মুত্তাফাকুন আলাই। হ্যাঁ; পারলে কোন কথা নেই। নগদ দশের বদলে বিশ। তবে উবাদা ইবনুস সামিত রা. এর হাদীসের প্রতি নযর যেন না যায়। যা তিরমিযী শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত: ও হাদীস তো সহীহই নয়। আর দু' একজন সহীহ বললেও বা কী হবে?

সর্বজন স্বীকৃত সহীহ হওয়ার শর্ত তো আপনিই লাগিয়েছেন। এতো গেল হাদীসের কথা। কিন্তু কোনআনের আয়াতের কী উত্তর দিবেন? আল্লাহ যে বলেছেন- و إذا قرء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا الخ

অর্থাৎ-যখন কোরআন পড়া হবে, তোমরা তখন মনযোগ দিয়ে শুন এবং চুপ থাক।

এতো এমন দলীল যা আবু হুরায়রা রা., ইমাম শাফেয়ী রহ.ও মানেন। যারা হলেন মুক্তাদীর উপর ফাতিহা ওয়াজিব হওয়ার শক্তিশালী প্রবক্তা। হলে কী হবে? কোরআনের নির্দেশতো তো মানতেই হবে। এজন্যই আবু হুরায়রা রা. তাবীল করে দুই আয়াতের মধ্য বিরতিতে ফাতিহা পড়ে নিতে বলেন।

আর ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন এক লম্বা বিরতির কথা। ইমাম অন্য সূরা আর ফাতিহার মাঝে চুপ থাকবেন। এ সুযোগে মুক্তাদী ফাতিহা পড়ে নিবে। তবুও উবাদা রা. এর হাদীসের কারণে আয়াতের বিরোধিতা করার সাহস তারা করেননি। আপনার যদি এ হাদীস দিয়ে ঐ আয়াতের মুকাবালা করার হিম্মতই থাকে, তাহলে এ মধ্য বিরতি আবিষ্কারের পথ বেছে নিলেন কেন? হাদীসে তো বিরতি টিরতির শর্ত ছাড়াই মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহা পড়তে বলা হয়েছে। যা আবিষ্কার করলেন তো করলেন; কিন্তু আপনি তো আহলে হাদীস। আপনাকে হাদীস দেখাতে হবে। সুতরাং আপনার দরবারে বিনীত নিবেদন হল- সহীহ, মুত্তাফাক আলাই হাদীসের কথা রাখেন। কোনমতে একটি যয়ীফ হাদীস দিয়ে হলেও আপনার বিরতির মাসআলাটি প্রমাণ করুন। আয়াত ও আয়াতের মাঝেরটা (মানে ইমাম সূরা ফাতিহার এক আয়াত পড়ে চুপ থাকবে এই ফাঁকে মুক্তাদী উক্ত আয়াত পড়ে নিবে।) প্রমাণ করলেও হবে। ফাতিহা ও অন্য সূরার মধ্যবর্তী 'লম্বা বিরতি' (মানে ইমাম সূরা ফাতিহা পড়ে অন্য সূরা মিলানোর আগে লম্বা সময় চুপ থাকবে। এসময় মুক্তাদী সূরা ফতিহা পড়ে নিবে।) প্রমাণ করলেও হবে। ওমা এত কষ্ট করলেন পুরস্কার দিব না! একেবারে নগদ। গুণে গুণে দশের বদলে বিশ।

কিন্তু হযরত! যদি না পারেন, কোরআনের নির্দেশ অমান্য করার পরিণাম কী হবে? নতুন করে ভাবুন।

এবার আসুন! আপনাকে একটি সূত্র শুনাই। সূত্রটি হল- হাদীসে গায়রে মুতাওয়াতির দিয়ে কোরআনের আয়াতের মোকাবালা করা যায় না। আচ্ছা ধরে নিলাম আপনি মোকাবলা করতে পারবেন; কিন্তু কী ফায়দা হবে? তখন আপনি হবেন হাদীসের অনুসারী। আর আমরা হব কোরআনের অনুসারী। কীসের সাথে কী! আপনার সামনে এখনো একটি রাস্তা খোলা আছে। আয়াতটিকে একটু তাবীল করে নিলেন। অর্থাৎ বিরতি বা লম্বা বিরতির মারপ্যাঁচে আয়াতটির একটি রফাদফা করে ছাড়লেন। ঠিক আছে আপনার জন্য রাস্তাটি ছেড়ে দেয়া হল। কিন্তু তখন তো আমরাও হাদীসটার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা করে আয়াত ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় করে নিব। কী তাহলে পারলেন না বুঝি? এতো গেল তর্কে হারার কথা। ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন আমাদের দলীলও অনেক ওযনী । সুতরাং কথাতো মজবুত হবেই। তাহলে আর থাক । এক আয়াত দিয়েই যখন কুপোকাত, আর কোন কিছুই উল্লেখ করব না। হাদীসই যখন উল্লেখ করতে হলনা অন্যান্য দলীল, উম্মতের এক বড় অংশের ঐক্যমত: এসব উল্লেখ করেই বা কী করি।

পাল্টা চ্যালেঞ্জ-৫: তাকলীদ

আপনি আমাদের নিকট তাকলীদ ওয়াজিব হওয়ার দলীল দাবী করেছেন। এতো অনেক পরের কথা। আমারা আপনার নিকট রাসূল সা. এবং হাদীসে রাসূল সা. এর অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার দলীল প্রার্থনা করছি। বলবেন কোরআনে আছে। ঠিক আছে আমরাও মানি কোরআনে আছে। তাহলে কোরআনের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার দলীল পেশ করুন। বলবেন হাদীসে আছে। জানি একথাই বলবেন। কিন্তু বিষয়টি যে গোলমেলে হয়ে গেল। বুঝেননি? সুস্পষ্ট করে বলছি। প্রথমটার দলীল যদি দ্বিতীয়টি হয়; দ্বিতীয়টির দলীল কী হবে? প্রথমটি? না, সেতো হতে পারেনা। একটু সূক্ষ্ম হয়ে গেল, না? আবার বলছি যদি প্রথমটার দলীল দ্বিতীয়টি হয় এবং দ্বিতীয়টির দলীল প্রথমটি হয়, তাহলে প্রথমটার দলীল ঘুরে ফিরে প্রথমটার নিকটই থেকে গেল। মানে প্রথমটা নিজের দলীল নিজে হয়ে গেল। এ তো পাগলেও মানবেনা। আর যদি

প্রথমটার দলীল আবারও দ্বিতীয়টিকে বলেন তাহলে তো এক অনন্ত ঘূর্ণনের সৃষ্টি হবে। ঘূর্ণন থামার আগে কোনটি কোনটার দলীল হবেনা। হ্যাঁ একটা পথ আছে। আরো দু'চারজন আহলে হাদীস ডেকে আনুন। তারপর একজনকে ওহীপ্রাপ্ত ঘোষণা করুন। ব্যস, কেল্লা ফতে। ওহীও পেলেন, দলীলও পেলেন। রাসূল সা. কে শেষ নবীও মানলেন। এছাড়া আর তো কোন উপায় নেই। যেমন হবে হোক। । দলীল দিতে পারলেই দশে বিশ। একদম নগদ। শেষে একটা কথা বলি। আপনি তাকলীদ ওয়াজিব হওয়ার দলীল চেয়েছিলেন তো! আপনাকে দলীল দেয়া হবে। আপনি হাদীসের অনুসরণ, কোরআনের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার দলীল যে দেশ থেকে আমদানী করবেন, আমরা তাকলীদ ওয়াজিব হওয়ার দলীল সেখান থেকেই এনে দিব।

আহলে হাদীস কি গায়রে মুকাল্লিদ?

আহলে হাদীস গায়রে মুকাল্লিদ নয়। তাদেরকে এ অর্থে গায়রে মুকাল্লিদ বলা হয় যে, তারা ইমাম চতুষ্টয়ের কারো তাকলীদ করেন না। হাকীকত তালাশ করলে তারাও মুকাল্লিদ। কেননা লা-মাযহাবী একটি স্বতন্ত্র চিন্তাকেন্দ্র। এক কথায় যত আহলে হাদীস আছে তারা তাদের মাসআলা- আহলে হাদীস আলেমের নিকটই জিজ্ঞাসা করে। যে রকম কোন হানাফী মাসআলা-মাসায়েল হানাফী আলেমের নিকটই জিজ্ঞাসা করে। সুতরাং উভয় দলের কর্মপদ্ধতি একই রকম। এখন মাযহাব পন্থীদের তাকলীদ যদি তাকলীদে শখছী হয়, তাহলে তাদের এ কর্মপদ্ধতি তাকলীদ বরং তাকলীদে শখছী না হয়ে কী হবে? প্রকৃত প্রস্তাবেই যদি তারা গায়রে মুকাল্লিদ হত, তাদের মাসআলা-মাসায়েল শুধু আহলে হাদীস আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা না করে সব আলেমের নিকটই জিজ্ঞাসা করত। চাই সে হানাফী হোক বা শাফেয়ী বা আহলে হাদীস। কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে, তারা আহলে হাদীসের গন্ডি পার হয়ে অন্য কোন আলেমের নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করেনা। সুতরাং তারা নিজেদেরকে গায়রে মুকাল্লিদ নাম দেয়ার কোন যুক্তিই নেই।

এখন প্রশ্ন হল তারা তাকলীদই যখন করে ইমাম চতুষ্টয়ের কারো তাকলীদ করে না কেন? এর সরল উত্তর হল- ইমাম চতুষ্টয় ইজমাকে

হুজ্জত মনে করেন। আর তারা ইজমাকে হুজ্জত মানতে রাজি নয়। শুধু এ বিরোধই তাদেরকে ইমাম চতুষ্টয়ের কারো তাকলীদ থেকে বিরত রেখেছে। তবে মুসলিম মিল্লাতের কাছে তারা একথাটি সুস্পষ্ট করে বলতে সাহস পায়না। কেননা উম্মত তাহলে তাদেরকে চোখের কিনারায়ও স্থান দিবেনা। (আহলে হাদীস যত সাহসীই হোক, সমাজচ্যুত হওয়ার ভয় সবার মাঝেই আছে) আরো একটি কারণ হল- আধিকাংশ আহলে হাদীস তখন দলত্যাগী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য এ ছদ্মবেশী মুকাল্লিদরা মানুষকে এই বলে প্রতারিত করে যে, এই চার ইমাম হল চারটি মুর্তি। এদের তাকলীদ হল শিরক। এদেরকে ছাড়। আমাদেরকে ধর মানে আমাদের তাকলীদ কর।

আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানকে তাদের ধোকা থেকে হেফাজত করুন। সবাইকে তার সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন। (তাসহীলে আদিল্লায়ে কামেলা, পৃষ্ঠা নং-৮৭/৮৮)

পাল্টা চ্যালেঞ্জ-৬: যোহরের শেষ সময়

যোহরের ওয়াক্ত এবং আছরের ওয়াক্তের ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মত অন্যান্য ইমামগণের মতই। ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকেও অনুরূপ একটি মত রয়েছে। এ মতের উপরই হারামাইন শরীফাইন (মক্কা ও মদীনা) সহ অনেক শহরের আমল। কিন্তু যাহিরুর রেওয়ায়াতে ইমাম আবু হানিফার থেকে দুই মিছিল পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকা এবং দুই মিছিলের পর আছরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার মত রয়েছে। যাক, পক্ষপাতমুক্ত হওয়ার কারণেই এসব স্বীকার করা। কিন্তু আপনি অযথা লড়তে উদ্যত হলে তো ছাড় দেয়ার কোন মানে হয়না। তাহলে শুনুন- ইমাম মুহাম্মদ ও ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া রহ. সূত্রে বর্ণিত মুআত্তা মালেক রহ. এর মধ্যে আবু হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি হল-

صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، و العصر إذا كان ظلك مثليك

অর্থাৎ তুমি যোহরের নামায আদায় কর যখন তোমার ছায়া তোমার সমপরিমাণ হবে। আর আছরের নামায আদায় কর যখন তোমার ছায়া তোমার দ্বিগুণ হবে।

হাদীসটি যদিও মাওকুফ; কিন্তু এমন বিষয়ে কোন সাহাবী নিজের থেকে কিছু বলার অধিকার রাখেন না। সুতরাং বাধ্য হয়েই হাদীসটিকে মারফু ধরে নিতে হবে। এ ধরণের হাদীসকে হুকমী মারফু বলা হয়। আর নামাযের ওয়াক্ত বর্ণনার অধ্যায়ে এক মিছিল বা দু'মিছিল বলতে ছায়ায়ে আছলী বাদ দিয়েই হিসাব করা হয়। অতএব, এখানেও ছায়ায়ে আছলী বাদ দিয়েই হিসাব করা হবে। অন্যথায় তা হবে সম্পূর্ণ ইনসাফ পরিপন্থি। এবার বলুন আবু হুরায়রা রা. এর হাদীস অনুযায়ী যোহরের নামায আদায় করা হলে, তা এক মিছিলের পরে হবে না পূর্বে? এক মিছিলের পরে যখন যোহরের ওয়াক্ত বাকী থাকে, আছরের ওয়াক্ত অবশ্যই দু'মিছিলের পরে শুরু হবে। খুবই সম্ভাবনা রয়েছে- নামাযের ওয়াক্তের ব্যাপারে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যোহরের ওয়াক্তের ব্যাপারে এক মিছিলের পরিমাণ রহিত হয়ে দু'মিছিল পর্যন্ত দীর্ঘ হয়েছে। ফলে আছরের ওয়াক্তের ব্যাপ্তি কিছুটা সংকুচিত হয়েছে। এজন্য সতর্কতা এবং তাকওয়ার দাবীতো এটাই যে, এক মিছিলের পূর্বে যোহরের নামায পড়ে নেয়া হবে। হ্যাঁ, যৌক্তিক কোন কারণে সম্ভব না হলে দু'মিছিলের পূর্বেই পড়ে নেয়া হবে। আর আছর সর্বদাই দু'মিছিলের পরে পড়া হবে। মূলত: যাহিরুর রেওয়ায়েতে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর উক্তির ব্যাখ্যা এটাই। বিবেকের পার্সপাতি কাজে লাগালে এটাই বুঝে আসবে যে, এ ব্যাখ্যা যুক্তি বিরুদ্ধ নয়। কারণ ওয়াক্ত বিষয়ক হাদীসগুলো এত স্পষ্ট অর্থবহ নয় যে, পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই। এরপর আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণিত হাদীস পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে আরও প্রবল করে দেয়। ওয়াক্ত বিষয়ক হাদীসসমূহের মাঝে যদি সমন্বয় সম্ভব না হত, বরং বিরোধ সৃষ্টি হত, আমরা আপনাদের দলীল 'হাদীসে ইমামতে জিবরাইল'কেই যা যোহর ও আছরের ওয়াক্তের মাঝে প্রথম মিছিলকেই সীমানা নির্ধারণ করে দেয়- প্রাধান্য দিতাম। কিন্তু ওয়াক্তের মাঝে পরিবর্তন সাধিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকা অবস্থায়, হাদীসসমূহের

মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার দাবী কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে? সুতরাং 'হাদীসে ইমামতে জিবরাইলকে' প্রাধান্য দেয়ার যেহেতু কোন পথ নেই, আবু হুরায়রা রা. এর হাদীসের উপর আমল করতে বাঁধা কোথায়? হ্যাঁ, আপনার নিকট যদি কোন হাদীসে সহীহ–যা আছরের নামায সর্বদা দু'মিছিলের পূর্বে আদায় করার সুস্পষ্ট অর্থ নির্দেশ করে–থাকে পেশ করুন। আমরা অবশ্যই গ্রহণ করব। অন্তত রাসূলের সা. জীবনের শেষ আছরের নামাযটা দু'মিছিলের পূর্বে আদায় করেছেন এটুকু প্রমাণ করলেও চলবে। মেনে তো নিবই, ২০টি রুপিও দিব। তবে হাদীসটি কিন্তু সহীহ, সরীহ, মুত্তাফাক আলাই হতে হবে। খালি গো ধরে বসে থাকলে তো আর হয় না। কিছু ইলম কালামও থাকা লাগে। দলীল বুঝার যোগ্যতা, এতো আল্লাহর দান। আর আপনার সম্পর্কে তো আপনিই ভাল জানেন। কিন্তু সাবধান। এমন যেন না হয়-

জোরে শোরে বলতেছিলাম,
কেমনে যেন ফেসে গেলাম।

পাল্টা চ্যালেঞ্জ-৭: ঈমানের সমতা

ঈমানের সমতার কয়েক অর্থ হতে পারে। যদি ইমাম আবু হানিফার রহ. কথার এ অর্থ বুঝেন যে, মুমিনের ঈমান আম্বিয়া এবং জিবরাইলের সাথে সবলতায়-দুর্বলতায় সমান। আপনিই বলুন এমন গাজাখুরি কথা কে বলে? আপনার এ দাবীর ভিত্তি কী? যদি থাকে পেশ করুন। দশের বদলে বিশ নিয়ে যাবেন। সত্য কথা হল আপনার এ দাবীর কোন সনদ নেই। সূতরাং এরূপ নির্জলা মিথ্যা দোষারোপ থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহর দরবারে একদিন ফিরে যেতে হবে। আর যদি এ অর্থ বুঝেন -যেসব বিষয়ের উপর আম্বিয়া ফেরেশ্তাগণের ঈমান, হুবহু ঐ সব বিষয়ের উপর একজন সাধারণ মুমিনেরও ঈমান। তাহলে বলুন কে এমন ঈমানের অস্বীকার করে? কোন হানাফী করলে তার নাম বলুন । সাক্ষী-প্রমাণ হাজির করুন। দশের বদলে বিশ নিবেন।

পাল্টা চ্যালেঞ্জ-৮ পরস্ত্রী বিবাহ করা

পরস্ত্রী বিবাহ করার বিষয়ে আপনি হানাফীদের উপর অগ্নিবর্ষণ করেছেন। অথচ আপনি যা বলেছেন তা হানাফীদের মতই নয়। দুররে মুখতার, শামী তো হাতের নাগালেই পাওয়া যায়। একটু খুলে দেখুন না! আর কত মুখস্থ অপবাদ দিয়ে যাবেন। আর যদি আপনার দাবী সত্যই হয়। দলীল পেশ করুন। দশের পরিবর্তে বিশ নিয়ে যাবেন। আল্লাহই জানেন আপনাদের এ অপবাদধারা কত কাল অব্যাহত থাকবে? আপনাদের বুঝের বৈশিষ্ট কি এমনই? এমন হলে তো আপনাদেরকে মাজুর রাখতে হয়। না এটা আপনাদের বুঝতে না চাওয়ার ফল? আপনি বলুন তো পরস্ত্রী তো দূরের কথা, অবিবাহিতা মেয়েলোকের ক্ষেত্রেও কি এমন হতে পারে?

পাল্টা চ্যালেঞ্জ-৯: চিরহারাম মহিলাকে বিবাহ করা

আপনি চিরহারাম মহিলাকে কেউ বিবাহ করলে, ব্যভিচার হবেনা কেন? জানতে চেয়েছেন। জানাতে পারলে ১০ রুপি পুরস্কার দিবেন বলেও ঘোষণা করেছেন। আমরা দলীল প্রমাণসহ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। (আদিল্লায়ে কামেলার মধ্যে বিস্তারিত জওয়াব রয়েছে) এবার আপনার পালা। আপনার দাবী তাদের বিবাহই হয়নি, যা করেছে সব ব্যভিচার হয়েছে। শক্তিশালী না হোক, কোন দুর্বল দলীলের আলোকে আপনার এ দাবী প্রমাণ করুন। কোন আয়াতে আছে কিংবা কোন হাদীসে? নিয়ে আসুন। যে কোন প্রকার দলীল হলেই চলবে। তবুও আপনার মুখটা বাচুক। ভদ্রলোক বলে কথা। দশের বদলে বিশ তো আপনার জন্য থাকছেই।

পুরস্কার তো ঘোষণা করলাম নিতে না পারলে কী আর করা। তবে অপবাদ দেয়ার পথে হাটেন না যেন। হানাফীরা চিরহারাম মহিলার সাথে বিবাহ বৈধ মনে করে, রাসূল সা. এর অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার দলীল নেই বলে দাবী করে, এ সব বলেন না যেন। এসব জওয়াব নয়, অপবাদ। (হাদীস মতে অপবাদ দেয়া চরম গর্হিত।) অনেক জিনিস তো বৈধ না হলেও বিধান জারী হয়। (জানা নেই বুঝি? কী লজ্জার কথা! কতল করা অবৈধ। অথচ লোকটি ঠিকই মারা যায়। কিসাসও নেওয়া হয়। রুষ্ট হলেন? কী করব! ইটটি মেরেছেন বলেই তো পাটকেলটি খেয়েছেন। সুতরাং.....

পাল্টা চ্যালেঞ্জ- ১০: পানির পাক-নাপাকের মাসআলা

পানির পাক না পাকের মাসআলায় প্রকৃত মাযহাব হল- অল্প পানি অধিক পানির বিবেচনা করা। অল্প পানিতে নাপাকী পড়লে পানি নাপাক হয়ে যাবে। অধিক পানিতে পড়লে পানি নাপাক হবেনা। আর অল্প হওয়া অধিক হওয়া ব্যবহারকারীর মতের সাথে সম্পৃক্ত। তবে মানুষ সবাই সমান নয়। অল্প-অধিক নির্ধারণে যার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয় না 'দশ বাই দশ' তার জন্য একটি পরামর্শ মাত্র। এ হল সংক্ষিপ্ত জওয়াব। এবার আপনার মতামত বলুন। আপনার মতামত কী এ রকম যে, الماء طهور এ হাদীসের আলোকে পানি কখনেই নাপাক হয়না? দলিল হিসাবে বলবেন- ماء শব্দের 'আলিফ লাম' পানির ধর্ম বা পানির সমস্ত একক বুঝানোর জন্য এসেছে। তাহলে তো মহা সমস্যায় পড়ে যাবেন। কারণ প্রসাবকেও তখন পাক বলতে হবে। আর কোন হাদীসে পেলেন 'আলিফ লাম' পানির ধর্ম বা পানির সমস্ত একক বুঝানোর জন্য এসেছে? বেশী নয় একটি হাদীস পেশ করুন। দশে বিশ দিব। আর যদি অপনি অল্প-অধিকের পরিমাণ দু'মটকা পানি দ্বারা নির্ধারণ করেন, তা কিন্তু পারবেন না। কারণ হাদীসে কুল্লাতাইন তো মুযতারাব। সনদ, শব্দ, মতন তিন দিক থেকেই বিরোধপূর্ণ । জানেনেই তো হাদীসে মুযতারাব দ্বরা দলীল দেয়া যায়না। যদি পারেন গায়রে মুযতারাব হাদীস পেশ করুন। দশে বিশ দিব।

আহলে হাদীসের প্রতি

১০০ প্রশ্ন

মূল

আল্লামা আমীন ছফদার রহঃ
(মৃত্যু- ১৪২১ হি. ২০০০ ইং)

অনুবাদ

রুহুল্লাহ নোমানী

লিখক ও কিতাব সম্পর্কে

'আমীন ছফদার' আহলে হাদীসের এক আতংকের নাম। জীবনের পুরোটাই ব্যায় করেছেন আহলে হাদীসের সাথে সংগ্রাম করে। তাঁর কলম ও কালামের আঘাতে আহলে হাদীসের ইমারত কেঁপে উঠত, এখনো উঠছে। তিনি এমন এমন প্রশ্ন আহলে হাদীসের উপর রেখে গেছেন, যার সদুত্তর সম্মিলিত আহলে হাদীস শক্তি আজ পর্যন্ত দিতে প রেনি। সামনেও পারবেনা। ইনশাআল্লাহ। 'তাজাল্লিয়াতে ছফদারের' পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন যে, তিনি আহলে হাদীসের অসার দাবী খন্ডনে ও অসৎ প্রশ্নের উত্তর দানে কতটা সিদ্ধহস্ত। তিনি আহলে সুন্নতের সঠিক মাযহাব বয়ান ও আহলে হাদীসের প্রতি লাজওয়াব প্রশ্ন উত্থাপনে, অতুলনীয় দক্ষতা রাখতেন। غیر مقلدین سے دو سو اور علمائے غیر مقلدین سے چار سو سوالات নামক গ্রন্থে এমন এমন ৬০০ প্রশ্ন তুলে ধরেছেন আহলে হাদীসের ঝুলির তলী খুজলেও এর সমাধান বের হবে না। সেখান থেকে ইমাম বুখারী রহ:, বুখারী শরীফ ও তাকলীদ সংক্রান্ত ১০০ প্রশ্ন তাদের সমীপে পরিবেশন করা হল। সহপাঠী আনাস (ঢাকা) ভাই আধমকে বইটি সরবরাহ করেছেন। অধ্যয়নের পর অনুমিত হবে সূচকে তিরস্কার করা চালনীর জন্য কতটা নিলর্জ্জতা। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সুমতি দান করুক। আমীন।

আহলে হাদীস বন্ধুদেরকে অনুরোধ করব আড়ালে-আজলে, আগোচরে-অন্তরালে আপনাদের হম্বি-তাম্বি, চ্যালেঞ্জ ঘোষণা, লিফলেট বিতরণ রীতিমত প্রশংসার! দাবী রাখে। কিন্তু এভাবে আর কত কাল? এবার বাস্তব ময়দানে আসুন। দয়া করে সর্ব শক্তি নিয়োগ করে হলেও প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। আল্লাহ আপনাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। হ্যাঁ পারলে আরো দেয়া হবে। আমরা প্রশ্নের ঝুলি পূর্ণ করে রেখেছি।

লিখক রহ. আহলে হাদীস ওলামা ও আওয়ামের জন্য পৃথক পৃথক প্রশ্নপত্র তৈরী করেছিলেন। কিন্তু আমরা সে পথে না হেটে একই প্রশ্ন দু'জনের কাছেই রেখেছি। কারণ তাদের মাঝে যার ইলম যত কম সে তত বেশী কট্টর। সুতরাং বিভাজন করলে অ-আলেমদের ইলমের(!) বে-কদরী হতে পারে। অথচ সবাইকে তার উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য হাদীসে নির্দেশ এসেছে।

বিনীত,
রুহুল্লাহ নোমানী

ইমাম বুখারী রহ. ও বুখারী শরীফ সংক্রান্ত ১৪টি প্রশ্ন

১. কোরআন শরীফের পরে সবচে' বিশুদ্ধ কিতাব বুখারী শরীফ, এটা আল্লাহর বাণী না রাসূলের বাণী?

২. বুখারী শরীফে পূর্ণ এক রাকাআত নামাযের পরিপূর্ণ বিবরণ আছে কি?

৩. বুখারী শরীফে কি-

سبحان ربى الأعلى، سبحان ربى العظيم، سبحانك اللهم

অথবা তাশাহহুদে দরূদ পড়ার কথা আছে?

৪. বুখারী শরীফে কি সীনার উপর সর্বদা হাত বাঁধার হাদীস আছে?

৫. বুখারী শরীফে উটনীর দুধ খাওয়ার কথা আছে। এর উপর আহলে হাদীস আমল করেনা। অথচ গরু, মহিষের দুধ খাওয়ার কথা কোন হাদীসে নেই। (তবুও মজা কেন কেন খায়? তারা তো হাদীসের বাহিরে যেতে একদম নারাজ।)

৬. বুখারী শরীফে বোগলের অবাঞ্চিত লোম উপড়ে ফেলার হুকুম রয়েছে (২/৮৭৫)। তাহলে আহলে হাদীস ব্লেড ব্যবহার কেন করে? এর পক্ষে তো কোন হাদীস নেই।

৭. রাসূল সা. বলেছেন– যে ব্যক্তি সর্বদা রোযা রাখে, সে কোন রোযাই রাখেনি (১/২৬৫)। অথচ ইমাম বুখারী রহ. সর্বদা রোযা রাখতেন। (ইমাম বুখারী হাদীসটি বুঝেন নি? খবরদার তাবীল করবেন না।

৮. রাসূল সা. বলেছেন– মুসিবতের সময় কেউ যেন কোনক্রমেই মৃত্যুর তামান্না না করে (২/৮৪৭)। কিন্তু এ হাদীসের বিপরীতে ইমাম বুখারী রহ.ই মৃত্যু কামনা করেছেন। (তারীখে বাগদাদ ২/৩৪) (ইমাম বুখারী হাদীস মানতেন না? নিজ থেকে ব্যাখা করার সুযোগ নেই কিন্তু!)

৯. রাসূল সা. বলেছেন– বেশীর থেকে বেশী সপ্তাহে একবার কোরআন খতম কর। এর থেকে বেশী পড়না। (২/৭৫৬) কোন কোন হাদীসে তিন দিন, কোন কোন হাদীসে পাঁচ দিনের কথাও এসেছে। তবে অধিকাংশ হাদীসেই সাত দিনের কথা এসেছে (বুখারী) অথচ ইমাম বুখারী রহ. রমযান মাসে প্রতিদিন এক একবার খতম করতেন। (তারীখে বাগদাদ ২/১২, তবকাতে সুবকী ২/৯, আল হুত্তা ২২) (আপনারা কী ইমাম বুখারী থেকেও বড় আহলে হাদীস?)

১০. আহলে হাদীস বলেন– আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস (১/২২৯) দ্বারা প্রমাণিত যে, তারাবীহ-তাহাজ্জুদ একই নামায। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. রমযান মাসে তারাবীর পরে তাহাজ্জুদও পড়তেন। তিনি কি হাদীসের বিরোধিতা করতেন?

১১. ইমাম বুখারী রহ.– হাদীস বর্ণনা করেন যে, কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাত বার ধৌত কর। পানি নাপাক হওয়ার মাসআলায় তার মাযহাব হল- রং, গন্ধ, স্বাদ পরিবর্তন না হলে পানি নাপাক হয় না। (১/২৯) একথা তো স্পষ্ট যে, কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে পানির রং, গন্ধ, স্বাদ কিছুই পরিবর্তন হয় না। (সুতরাং তার নিকট কুকুরের ঝুটা পাক আপনাদের মতামত কী?)

১২. বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের ঝুটা নাপাক। (১/২৯) কিন্তু এর বিপরীতে ইমাম বুখারী রহ.ই বলেন- কুকুরের ঝুটা দ্বারা অযু করা জায়েয। (১/২৯) (এতো হাদীসের স্পষ্ট বিরোধিতা। এখন কী বলবেন- ইমাম বুখারী রহ. ভ্রান্ত ছিলেন?

১৩. ইমাম বুখারী রহ. বলেন– মুছল্লীর পিঠে নাপাক বস্তু এবং মৃত প্রাণী রেখে দিলেও নামায ভেঙ্গে যায় না। (১/৩৭) (আহলে হাদীসের মাযহাব কী?)

১৪. ইমাম বুখারী রহ. এর নিকট খোলা রেখেও নামায জায়েয। (১/৫২) (আপনারা কী বলেন?)

তাকলীদ ও আহলে হাদীস

তাকলীদের সংজ্ঞা:

তাকলীদ হল– কারো কথা শুধুমাত্র এ সুধারণার উপর মেনে নেয়া যে, তিনি দলীলের আলোকে বলেছেন এবং তার থেকে দলীল ত্বলব না করা। (ফতওয়ায়ে ছানাইয়্যা ১/২৫৬, ১/২৬০, ১/২৬২, ১/২৬৫ কুরআন-হাদীসে বিশেষজ্ঞ কারো দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কোরআন সুন্নাহর উপর আমল করা। (ইকদুল জীদ, শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.৪৭০)

তাকলীদের প্রকারভেদ:

(তাকলীদ দু' প্রকার। যথা:)

১. তাকলীদে মুতলাক (মুক্ত তাকলীদ): অনির্দিষ্টভাবে কোন আলেমের থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে আমল করা। এটা আহলে হাদীসের মাযহাব।

২. তাকলীদে শখছী (নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ): ইমাম চতুষ্টয়ের থেকে যে কোন একজনের অনুসরণ করা। এটা মুকাল্লেদীনের (আহলে সুন্নতের) মাযহাব। (ফাতওয়ায়ে ছানাইয়্যা-১/২৫১)

মা'রেফাতে দলীল:

দলীল সম্পর্কে অবগতি– এর অর্থ হল– দলীলকে পুরোপুরি জানা। অর্থাৎ এটা নিশ্চিত হওয়া যে, এ দলীলের বিপরীতে অন্য কোন দলীল নেই, থাকলেও উক্ত বিপরীত দলীলের 'এই এই' জওয়াব এ দলীলটি মানসূখ বা রহিত হয়নি ইত্যাদি। কোন দলীল সম্পর্কে এমন অবগতি লাভ করা মুজতাহিদের কাজ। এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা।

(ফতওয়ায়ে ছানাইয়্যা- ১/২৬৩)

অর্থাৎ প্রত্যেক দলীলে তিনটি বিষয় জরুরী। যথা:

১. দলীলটি তাওয়াতুর কিংবা সনদে সহীহ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে।

২. দলীলটি দাওয়ার (দাবী) উপর স্পষ্ট ইঙ্গিতবহ হতে হবে।

৩. অন্য কোন দলীল এ দলীলের সাথে বিরোধপূর্ণ না হতে হবে।

তাকলীদের হুকুম:

তাকলীদে মুতলাক (মুক্ত তাকলীদ) ওয়াজিব। (মি'য়ারে হক পৃষ্ঠা ৪১, তারীখে আহলে হাদীস পৃষ্ঠা: ১২৫, দাউদ গজনবী পৃষ্ঠা: ৩৭৫)

তাকলীদে শাখছী (নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ) মুবাহ। এটা তরক করার দ্বারা কোন প্রকার গুনাহ হবে না। অর্থাৎ মুকাল্লিদ কোন একজন ইমামকে বিশেষজ্ঞ মনে করে সর্বদা তার অনুসরণ করবে। তবে নির্দিষ্ট একজন ইমামের অনুসরণকে হুকুমে শরয়ী মনে করবে না।

(ফতওয়ায়ে ছানাইয়্যা- ১/২৫২, মি'য়ারে হক পৃষ্ঠা: ৪১, তারীখে আহলে হাদীস ১২৫, দাউদ গজনবী ৩৭৫)

এতক্ষণ আমরা তাকলীদ সম্পর্কে আহলে হাদীসের মাযহাব ও দৃষ্টিভঙ্গি তাদের চার মূল স্তম্ভ বরং চার ইমাম তথা মাওলানা নযীর হুসাইন সাহেব দেহলবী, মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব শিয়ালকোটী, মাওলানা ছানাউল্লাহ সাহেব অমৃতসারী এবং মাওলানা দাউদ সাহেব গজনবী থেকে উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করেছি। এখন বন্ধুদের প্রতি আহ্বান হল– তারা নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নগুলোর জওয়াব দিয়ে বাধিত করবেন।

তাকলীদ সংক্রান্ত ৮৬ টি প্রশ্ন

১৫. ওয়াজিব কাকে বলে? ওয়াজিব তরককারীর হুকুম কী? সহীহ, সরীহ এবং বিরোধহীন হাদীসের আলোকে জওয়াব প্রদান করুন।

১৬. তাকলীদে মুতলাক ওয়াজিব। এ দাবী কোরানের আয়াত অথবা সহীহ, সরীহ, বিরোধহীন হাদীস দিয়ে প্রমাণ করুন।

১৭. আপনাদের নিকট তাকলীদে মুতলাক ওয়াজিব। সুতরাং আপনারাও মুকাল্লিদ। তাহলে নিজেদেরকে গায়রে মুকাল্লিদ বলে পরিচয় দেন কেন?

১৮. মুবাহ কাকে বলে? মুবাহ তরককারী এবং মুবাহ অনুযায়ী আমল কারীর হুকুম কী?

১৯. তাকলীদে শখছী মুবাহ। কুরআনের আয়াত কিংবা সহীহ, সরীহ, এবং বিরোধহীন হাদীসের আলোকে প্রমাণ করুন।

২০. কোন আলেম মাসআলা বলার সময় দলীলের পূর্ণ বিবরণ পেশ করা ফরয না ওয়াজিব? কোরআন-হাদীসের থেকে দলীল পেশ করুন।

২১. হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব 'মুছান্নাফে আব্দুর রায্যাক' এ সাহাবা ও তাবেয়ীনের প্রায় সতের হাজার (১৭,০০০) ফতওয়া রয়েছে। যাতে সাহাবা ও তাবেয়ীনের কেউ আপন ফতওয়ার সাথে কোরআন-হাদীস থেকে দলীল পেশ করেননি। তারা ফরয ওয়াজিবের তরককারী ও গুনাহগার হয়েছেন কিনা?

২২. এ সতের হাজার ফতওয়ায় প্রশ্নকারীও দলীল তলব করেননি। সুতরাং দলীল ত্বলব না করে এবং দলীলবিহীন মাসআলা মেনে নিয়ে তারা তাকলীদই করেছেন। প্রশ্নহল ঐ সকল সাহাবা এবং তাবেয়ীরা দলীল ত্বলব না করে এবং তাকলীদ করে কাফের হয়েছেন না ফাসেক? সহীহ হাদীসের আলোকে জওয়াব দিন।

২৩. অশিক্ষিত বা জেনারেল শিক্ষিত সকলের জন্যই প্রত্যেক মাসআলার পরিপূর্ণ দলীল সর্ম্পকে অবগত হওয়া ফরয না ওয়াজিব? সহীহ হাদীসের আলোকে জওয়াব দিন।

২৪. জেনারেল শিক্ষিত অধিকাংশ আহলে হাদীসই আলেমদের থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে আমল করে এবং দলীল ত্বলব করে না। ঐ সকল মানুষেরা আলেমদের মুকাল্লিদ হয়েছে না হয়নি?

২৫. আওয়াম আহলে হাদীসরা দেওবন্দী আলেমদের থেকেও মাসআলা জিজ্ঞাসা করে না, বেরেলবী আলেমদের থেকেও না। তারা শুধু আহলে হাদীস আলেমদের থেকেই মাসআলা জিজ্ঞাসা করে। এটা তাকলীদে শখছী না মুতলাক? নির্দিষ্ট কোন ফিকহ অনুসরণ করাইতো তাকলীদে শখছী।

২৬. হানাফী মাযহাবে অধিকাংশ মাসআলায় ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মতের উপর ফতওয়া হয়। কিছু কিছু মাসআলায় ইমাম আবু ইউসুফ বা মুহাম্মদের (রহ.) মতের উপর, আবার কোন মাসআলায় ইমাম যুফারের মতের উপর ফতওয়া হয়। এটাকে কী বলা হবে- তাকলীদে শখছী না মুতলাক?

২৭. চলমান আলোচনা যেহেতু মুজতাহিদের তাকলীদ নিয়ে, কোরআন-হাদীসের আলোকে মুজতাহিদের সংজ্ঞা বলুন।

২৮. মুজতাহিদ হওয়ার শর্তসমূহ কোরআন-হাদীসের আলোকে বয়ান করুন।

২৯. কোরআন-হাদীসের আলোকে মুজাতাহিদের জন্য ইজতিহাদের গন্ডি নির্ধারণ করুন।

৩০. তাকলীদের উল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকে আল্লাহ ও রাসূলের কথা দলীল ত্বলব করা ব্যতীত মেনে নেয়া, তাকলীদ না অন্য কিছু?

৩১. উক্ত সংজ্ঞার আলোকে উসূলে হাদীসের কাওয়ায়েদ (মূলনীতিসমূহ) দলীল ত্বলব করা ব্যতীত মেনে নেয়া তাকলীদ না অন্য কিছু?

৩২. উসূলে হাদীসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শাফেয়ী মাযহাবের মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করা এবং হানাফী মাযহাবের মূলনীতিসমূহ সম্পূর্ণ তরক করা, তাকলীদে মুতলাক না শখছী?

৩৩. 'আসমাউর রিজাল' এর কিতাবসমূহ থেকে জারাহ এবং তা'দীল সংক্রান্ত উক্তিসমূহ দলীল ত্বলব করা ব্যতীত মেনে নেয়া তাকলীদ না অন্য কিছু?

৩৪. জারাহ-তা'দীলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শাফেয়ী মাযহাবের কিতাবসমূহ দলীল ত্বলব করা ব্যতীত মেনে নেয়া এবং হানাফী মাযহাবের কিতাবসমূহ তরক করা, তাকলীদে মুতলাক না শখছী?

৩৫. হাদীসের কিতাবসমূহের থেকে মিশকাতকে মানা ও যুজাজাতুল মিশকাতকে না মানা, বুলুগুল মারামকে মানা ও মুসতাদাল্লাতে হানাফিয়্যাহ (হানাফীদের দলীল) কে না মানা, মুয়াত্তা মালেককে মানা ও মুয়াত্তা মুহাম্মদকে না মানা, তিরমিযীকে মানা ও ত্বহাবীকে না মানা, জুযউল কিরাআতকে মানা ও কিতাবুল আছারকে না মানা, কিতাবুল কিরাআতকে মানা ও কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনাকে না মানা তাকলীদে মুতলাক না তাকলীদে শখছী?

৩৬. হাদীস সহীহ, যয়ীফ হওয়ার ক্ষেত্রে আহলে হাদীস আলেমদেরকে মানা, হানাফী আলেমদের উপর বিলকুল নির্ভর না করা, তাকলীদে মুতলাক না শখছী?

৩৭. ইয়াহুদীরা তাদের ধর্মগুরুদের তাকলীদে শখছী করত না মুতলাক? দলীল হিসাবে কোরআনের আয়াত কিংবা হাদীসে সহীহ পেশ করুন।

৩৮. তাদের তাকলীদ যদি তাকলীদে শখছী হয়, তাহলে তাদের মুজতাহিদীনের নাম বলুন। যাদের দিকে তাদের ধর্মকে নিসবত করা হয়। তবে নামগুলো কোরআন-হাদীস থেকে পেশ করবেন।

৩৯. মুশরিকরা তাদের বাপ-দাদাদের তাকলীদ করত। এটা কোন ধরণের তাকলীদ ছিলো- মুতলাক না শখছী? কোরআন হাদীস থেকে বলুন।

৪০. যদি তাকলীদে শখছী হয়, তাদের কতটি দল-উপদল ছিল? কোরআন-হাদীস থেকে বয়ান করুন।

৪১. মুহাদ্দেসীন হাদীসের যে প্রকারসমূহ বয়ান করেছেন– এগুলো কুরআনে আছে না হাদীসে? আর উম্মাতের আবিষ্কৃত এসব প্রকার ও প্রকরণ দলীল অনুসন্ধান ব্যতীত মেনে নেয়া, তাকলীদ না অন্য কিছু?

৪২. তাকলীদে মুতলাক ওয়াজিব। আর মুতলাকের দুটি শাখা। যথা: শখছীও গয়রে শখছী। তাহলে ওয়াজিব হওয়ার বিধানও উভয় প্রকারের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এক প্রকারকে ওয়াজিব অন্য প্রকারকে মুবাহ বলা অযৌক্তিক, বরং ভিত্তিহীন। যেমন- কসম ভঙ্গ হলে কাফফারা দেয়া ওয়াজিব। এ ওয়াজিব আদায়ের সমান তিনটি রাস্তা রয়েছে। খানা খাওয়ানো, কাপড় দেয়া, এবং রোযা রাখা। যেকোন একটি দিয়ে আদায় করলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। (এখন একটাকে ওয়াজিব বলা, অন্যটাকে মুবাহ বলা ভিত্তিহীন নয় কি?)

৪৩. আপনাদের নিকট কি প্রত্যেক মানুষই মুজতাহিদ না কিছু সংখ্যক? কুরআনে তো মুজতাহিদ গায়রে মুজতাহিদ, দু'স্তরের কথাই বলা হয়েছে।

ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم

তারা যদি ব্যাপারটি রাসূল সা. এবং তাদের মধ্যকার উলীল আমরের নিকট নিয়ে যায়, অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা উদ্ভাবন ক্ষমতার অধিকারী তারা সঠিক বিষয়টি বুঝে নিবে।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন– **فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون**

যদি না জান, যারা জানে তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর? আপনাদের কি এসব আয়াত মানতে আপত্তি আছে?

৪৪. মুজতাহিদ দু'অবস্থা থেকে খালি নয়। সে নিজেই শরীয়তের চার দলীল থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করবে। অথবা অন্য মুজতাহিদের উদ্ভাবিত মাসআলার উপর আমল করবে। প্রথমজন মুজতাহিদ দ্বিতীয়জন খাটি মুকাল্লিদ। দ্বিতীয় জনের মধ্যে ইজতিহাদের শর্তসমূহ অনুপস্থিত থাকার করণে তার ইজতিহাদ বাতিল। শর্তের প্রতি খেয়াল না করে নামায আদায়কারীর নামায যেমন বাতিল।

৪৫. গায়রে মুজতাহিদ-মুজতাহিদের অনুসরণ করার দু'টি পথ রয়েছে। সে নির্দিষ্ট কোন মুজাতাহিদের মাযহাবকে অন্য সকল মাযহাব থেকে অগ্রগন্য মনে করবে। তাহলে এটা তাকলিদে শখছী হবে।

কেননা, মারজুহ তথা অগ্রাধিকারমুক্ত মাযহাব অনুযায়ী আমল করা সর্বসম্মতিক্রমে না জায়জে। অথবা তিনি সবগুলোকে বরাবর মনে করে যে কোন একটি অনুযায়ী আমল করবেন। তাহলে এটা হবে কারণ ছাড়াই কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া। যা জায়েয নেই।

৪৬. তাকলীদে গয়রে শখছী এর সূরত কী হবে? গায়রে মুজতাহিদ সমস্ত মুজতাহিদের মাযহাবকেই বরাবর মনে করবে? এমনটা অসম্ভব। কেননা, ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে এক মুজতাহিদ যে বস্তুকে হালাল মনে করেন, অনেক ক্ষেত্রে অন্য মুজতাহিদ সেটাকে হারাম মনে করেন। এখন সব মতই বরাবর হলে উক্ত গায়রে মুজতাহিদের জন্য কোন বস্তুই হালালও হবেনা, হরামও হবেনা। আর কোন বস্তু হালালও নয় হারামও নয়, এমন দাবী করা অযৌক্তিক ও বাতিল। সুতরাং সমস্ত মাযহাবকে বরাবর মনে করাও অযৌক্তিক ও বাতিল।

৪৭. যদি গায়রে মুকাল্লিদ চারো মাযহাবকে কবুল-তরকের ক্ষেত্রে বরাবর মনে করে, তাহলে তাকলীফে শরয়ী (শরীয়ত কর্তৃক বিধান আরোপ) বেকার হয়ে যাবে। সব কিছুই হালালও হয়ে যাবে; আবার হারামও হয়ে যাবে। মন চাইলে হালালের প্রতি ধাবিত হবে, মন চাইলে হারামের প্রতি ধাবিত হবে। তখন এটা আর মুজতাহিদের তাকলীদ থাকবেনা। বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ হয়ে যাবে। তখন তার ক্ষেত্রে- فإن الجنة هى المأوى ونهى النفس عن الهوى (অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে প্রবৃত্তির পুজা থেকে বিরত রাখবে, তার ঠিকানা জান্নাত) এবং- أيحسب الإنسان أن يترك سدى (অর্থাৎ মানুষ কি ধারণা করে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?) আয়াত দু'টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে। মুজাতাহিদের নাম তো শুধু ধোঁকা দেয়ার জন্যই নিবে। আর প্রবৃত্তির অনুসরণকে কোরআন-হাদীস নাম দিয়ে গোমরাহ হবে। অধিকাংশ আহলে হাদীসের অবস্থা এর ব্যতিক্রম নয়।

৪৮. যদি কোন আহলে হাদীস এ দাবী করে যে, চারো মাযহাবের মধ্য থেকে যে মাসআলা কোরআন-হাদীসের বেশি নিকটবর্তী হবে, সেটাকে প্রাধান্য দিব । তাহলে নির্ভেজাল- গলদ কথা। ঐ রোগীর মত যে বলে আমি ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্র প্রথমে পরখ করব। যারটা ডাক্তারী উসূলের বেশী নিকটবর্তী মনে হবে, সেটা গ্রহণ করব। অথবা ঐ বিচার প্রত্যাশীর মত যে বলে আমি প্রথমে বিচারকগণের ফায়সালা নিরীক্ষণ করে দেখব। এরপর যার ফয়সালা কানুনের বেশী নিকটবর্তী মনে হবে, সেটা গ্রহণ করব। কেমন আশ্চর্যের কথা-চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে অবগত না হলে ব্যবস্থাপত্র নিরীক্ষণের অধিকার থাকে না, অজ্ঞ বিচারপ্রার্থীর বিচার সংক্রান্ত মন্তব্য আদালত অবমাননা বলে গন্য হয়, অথচ ইজতিহাদের যোগ্যতাশূণ্য একজনকে মুজতাহিদীনের যোগ্যতা মাপার দায়িত্ব দেয়া হবে।

৪৯. মুকাল্লিদ যদি চার মাযহাবের কোন একটিকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মনে করে সেটা অনুযায়ী আমল করা তার জন্য আবশ্যক। কেননা, অগ্রাধিকারমুক্ত বিষয় রহিত বিষয়ের মত। এজন্যই রাজেহ এর মুকাবালায় মারজুহকে গ্রহণ করা উম্মতের ঐক্যমত্য অনুযায়ী বাতিল। সুতরাং তাকে রাজেহ অনুযায়ীই আমল করতে হবে।

৫০. এখন প্রশ্ন হল- মুকাল্লিদ একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য কিভাবে দিবে? এর উত্তর হল- প্রাধান্য দেয়ার পদ্ধতি দু'টি। যথা-

প্রথম পদ্ধতি: মুকাল্লিদ প্রত্যেক মাসআলায় চারো মাযহাবের বিস্তৃত দলীল সংগ্রহ ও বিচার-বিশ্লেষণ করে যে কোন একটিকে তারজীহ দিবে। কিন্তু এ পদ্ধতি মুকাল্লিদ গায়রে মুকাল্লিদ কারোই সাধ্যাধীন নয়।

যদি কোন গায়রে মুকাল্লিদ বা আহলে হাদীস পারঙ্গমতার দাবী করে, আমরা তার সামনে বিভিন্ন বিষয়ের মাত্র ১০০ মাসআলা পরিবেশন করব। গায়রে মুকাল্লিদ সাহেব প্রথমে প্রত্যেক মাসআলায় চারও ইমামের মাযহাব বয়ান করবেন। এরপর প্রত্যেক ইমামের দলীল বয়ান করবেন। এরপর এক ইমামের পক্ষ

থেকে অন্য ইমামের উপর আরোপিত প্রশ্নসমূহের সমাধান দিবেন ও প্রত্যেক ইমামের নিজ মাযহাবের পক্ষে দেয়া যুক্তিসমূহ খন্ডন করবেন। এরূপ চুলচেরা বিশ্লেষণের পর সহীহ, সরীহ, হাদীস দিয়ে যে কোন একটিকে তারজীহ (প্রাধান্য)দিবেন।

আমরা দীর্ঘ দিন যাবৎ আহলে হাদীস বন্ধুদেরকে এরূপ আহ্বান জানাচ্ছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল- হাহলে হাদীস হওয়ার দাবীদারদের, কেউ এ পর্যন্ত সাহস করেনি। সুতরাং এ তরীকা অবলম্বন করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ মুকাল্লিদ অস্পষ্টভাবে ও মোটামুটি কায়দায় যে কোন একটি মাযহাবকে প্রাধান্য প্রদান করবে। যেমন- একজন রুগী ডাক্তাদের ব্যবস্থাপত্র পরখ করার যোগ্যতা না রাখলেও তার মোটামুটি এ ধারণা থাকে যে, অমুক ডাক্তারের হাতে আল্লাহ তায়ালা হাজার হাজার রুগী সুস্থ করেছেন। শহরের সব বড় বড় ডাক্তার যে কোন জটিল সমস্যায় অমুক ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে থাকে। বড় বড় চিকিৎসকরা অমুক ডাক্তারকে ইমাম মনে করে। যেমন দাতারা হাতেম তায়ীকে, বীরেরা রুস্তমকে মুহাদ্দিসীন বুখারী রহ.কে, মুজাতাহিদীন আবু হানিফা রহ.কে, নাহবীরা খলীল ও আখফাশকে ইমাম মনে করেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতির কারণে একজন সাধারণ মানুষের মনেও তাদের শ্রেষ্টত্বের চিত্র অংকিত হয়ে যায়। অনুরূপ একজন সাধারণ মানুষের মনে কোন একজন ইমামের শ্রেষ্টত্বের বিশ্বাস স্থির হয়ে যায়। (আর এটাই হল তাকলীদে শখছী।)

৫১. দেখুন! একজন সাধারণ মুকাল্লিদও বুখারী শরীফের হাদীসকে অন্য হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু সে যে বুখারী শরীফের প্রত্যেক হাদীসের সনদ ও রাবীকে পরখ করে দেখেনি, একথা বলা যায়। হাদীস শাস্ত্রের বরেণ্য ইমামগণ বুখারী রহ. কে ইমাম মনে করনে, এ অস্পষ্ট দলীলই উক্ত সাধারণ লোকটির জন্য বুখারী শরীফকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপ ইমাম আবু হানিফাকেও ফিকহ শাস্ত্রের প্রাতঃস্মরণীয় ইমামগণ

ইমামে আযম লকব দিয়েছেন। যা থেকে যে কোন সাধারণ মানুষের নিকট ইমাম আবু হানিফার শ্রেষ্টত্ব দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত।

৫২. অনেক সময় আওয়ামের জন্য কোন একটি মাযহাবকে অগ্রাধিকার দেয়া অতি সহজ হয়ে থাকে। যেমন ইয়ামেনে মুয়ায রা. এর ইজতিহাদ সহজলভ্য ছিল। এজন্য ইয়ামেনের লোকেরা মুয়ায রা. এর ফতওয়ার উপর দীলল অনুসন্ধান ব্যতীত আমল করত। অনুরূপ উপমহাদেশে হানাফী মাযহাবের মুফতী আনাচে-কানাচে উপস্থিত। এখানে এ মাযহাব অনুযায়ী আমল করা সহজ। এজন্য এখানকার সকল শ্রেণীর মুহাদ্দিসীন, মুফাস্সিরীন, ফুকাহা, মুজাহিদীন, বাদশাহ এক কথায় সবাই ইমাম আবু হানিফার অনুসারী।

এজন্য শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. 'আল-ইনসাফে' লিখেন– এদেশে ইমাম আবু হানিফার তাকলীদ থেকে বের হওয়া মানে শরীয়তে মুহাম্মাদিয়্যা থেকেই বের হয়ে যাওয়া।

৫৩. একজন সাধারণ মুসলমানও জানে যে, মতবিরোধ দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই নিন্দনীয়। আর ঐক্যমত্য উভয় ক্ষেত্রেই কল্যাণকর। দেখুন! স্বয়ং রাসূল সা. বলেছেন– উত্তম নামায হল– যার কেয়াম দীর্ঘ হবে। যাতে কোরআন বেশী পরিমাণে পড়া হবে। কিন্তু মুয়ায রা. এর লম্বা কিরাআতের কারণে একজন মুসল্লী জামায়াত তরক করলে রাসূল সা. নারাজ হয়ে গেলেন। মুয়ায রা. কে ফেতনাবাজ আখ্যা দিলেন। (বুখারী)

মোটকথা, যদি কোন ওয়াজিব আদায়ের দু'টি পথ থাকে, যার একটি অবলম্বন করলে উম্মাতের মাঝে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। আর অপরটি দ্বারা ঐক্য অটুট থাকে। তাহলে আমল করার জন্য দ্বিতীয় ত্বরীকা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এদেশে যেহেতু শুরু থেকেই সকল মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী, এদেশীয় মুসলমানদের জন্য হানাফী মাযহাবই অগ্রগন্য হবে। কেননা, এ সূরতে উম্মতের মাঝে ঐক্য অটুট থাকে।

পরম্পরায় স্বীকৃত এবং পর্যবেক্ষণ সাক্ষী যে, হাজার বছরের অধিককাল যাবৎ এদেশে শুধু হানাফীই ছিল। এবং তাদের মাঝে সম্পূর্ণ ঐক্য বিরাজমান ছিল। মসজিদসমূহে শুধু ইবাদতই হত। ঝগড়া-ফাসাদের কোন সুযোগ বা সম্ভাবনেই ছিল না।

পর্যবেক্ষণ এ কথারও সাক্ষী যে, যেদিন থেকে আহলে হাদীস উম্মতের মধ্যকার এ গভীর ঐক্যের মাঝে চির ধরিয়েছে, সেদিন থেকে এ দেশে অনৈক্যের নরক সৃষ্টি হয়েছে। মসজিদসমূহ লড়াই ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। লাখো মসজিদ তালাবদ্ধ হয়েছে। মুসলমানদের হাজার হাজার টাকা মামলা-মুকাদ্দামার পিছনে খরচ হয়েছে। কোন কোন মামলা হাইকোর্ড থেকে 'প্রিভী কাউন্সিল লন্ডন' পর্যন্ত গড়িয়েছে। এ সমস্ত ফিৎনেই ইমাম আবু হানিফা রহ. এর তাকলীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ফলশ্রুতিতে প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য এ সংক্ষিপ্ত দলীলই যথেষ্ট যে, হানাফী মাযহাব অবলম্বন করলে উম্মতের মাঝে ঐক্য অটুট থাকে। আর বর্জন করার কারণে অনৈক্য ও শত-সহস্র ফিৎনার সৃষ্টি হয়।

৫৪. বুখারী শরীফ থেকে প্রমাণিত যে, রাসূল সা. এর প্রবল তামান্না ছিল কা'বা শরীফকে ইব্রাহীম আ. এর অবকাঠামো অনুযায়ী পূনরায় নির্মাণ করা। কিন্তু পুন:নির্মাণের কারণে কিছু লোকের দ্বীনত্যাগী হওয়ার আশংকা ছিল। শুধু এ কারণে রাসূল সা. মনের প্রবল আকাংখা পূরণ করা থেকে বিরত থাকেন।

এখান থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কোন তরীকা যদি আশংকাজনক হয় এবং অপর তরীকা আশংকামুক্ত হয়, তখন দ্বিতীয় তরীকা অবলম্বন করা আবশ্যক।

একইভাবে তাকলীদ বর্জনের এ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে এমন এমন অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙিখত ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে, যার হাজার ভাগের এক ভাগও তাকলীদের দীর্ঘ ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়নি।

একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য এ সংক্ষিপ্ত বুঝ যথেষ্ট যে, মাযহাব বর্জনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল হাজারো ফেৎনার জন্মদান। যা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ তাকলীদের নিরাপদ চত্বরে আশ্রয় গ্রহণ করা।

৫৫. দ্বীনকে যতটা শক্তভাবে ধারণ করা হবে, দ্বীনের মহত্ব ও শ্রদ্ধাও তত স্থায়ী হবে। আওয়াম যদি আপন চাহিদা মত চারও মাযহাব থেকে মাসআলা নির্বাচন করে আমল করতে শুরু করে তখন আর দ্বীনের সাথে তার বন্ধন অবশিষ্ট থাকবেনা। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান সবই নষ্ট করে ফেলবে। যে পথ দ্বীন ধ্বংসের কারণ হয়, সে পথ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কী সন্দেহ থাকতে পারে?

৫৬. ধরুন! যায়েদের দাঁত থেকে রক্ত বের হল। সে বলল, ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব মতে উযু ভাঙ্গেনি। এরপর সে গোপন অঙ্গ স্পর্শ করল। আর বলল– ইমাম আবু হানিফার মাযহাব মতে উযু ভাঙ্গেনি। এরপর সে এ অবস্থায়ই নামায পড়ে নিল। কী বলেন– তার নামায হয়ে গেছে? না তাকলীদে মুতলাক তার নামায বরবাদ করে দিল।

৫৭. এক হানাফীকে এক আহলে হাদীস কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ করার পরামর্শ দিল। হানাফীও তার পরামর্শ অনুযায়ী মাসেহ চালিয়ে গেল। কিন্তু নামাযে ইমামের পিছনে কিরাআত তরক করল। তখন হানাফীরা বলল তার উযু হয়নি বিধায় নামাযও হয়নি। আহলে হাদীসরা বলল সূরা ফতিহা পড়েনি বিধায় নামায হয়নি। ফলাফল কী হল?

তাকলীদে মুতলাকের ফাঁদে ফেলে তাকে এমন পরামর্শ দিল যে, হানাফী কিংবা আহলে হাদীস কারো নিকটই উক্ত ব্যক্তির নামায শুদ্ধ হয়নি।

৫৮. তাকলীদে মুতলাক হোক আর শখছী, শেষতক সেটা তাকলীদই। আপনারা তাকলীদে মুতলাককে ওয়াজিব বলার সময় এ কথা বলেন না যে, তাকলীদ শব্দটি কোরআন-হাদীসে কোথাও প্রচলিত

অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। সুতরাং তাকলীদে মুতলাক কে ওয়াজিব বলা যাবে না। তাহলে তাকলীদে শখছীর বেলায় এমন অযথা প্রশ্ন উত্থাপনের কী রহস্য?

৫৯. আহলে হাদীসের নিকট তাকলীদ মানে হল– কুত্তার গলায় বেড়ী লাগানো। কোন হাদীস অনুযায়ী, তাকলীদে শখছীর বেলায় এ অর্থ প্রযোজ্য আর তাকলীদে মুতলাকের বেলায় অপ্রযোজ্য? যদি তাকলীদে মুতলাকের বেলায়ও এ অর্থ প্রযোজ্য হয় তো কোন হাদীসে এসেছে যে, কুত্তার গলার বেড়ী মানুষের গলায় পরা ওয়াজিব? আর যদি প্রযোজ্য না হয় তো কোন হাদীসে পেলেন যে, আপনাদের জন্য যা ওয়াজিব তা তাকলীদে শখছীর বেলায় এসে এতই পচে গেল যে, ব্যবহারের উপযুক্ততাই হারিয়ে ফেলল?

৬০. আহলে হাদীস বন্ধুরা সাধারণত: বলে থাকে– তাকলীদ মানে অজ্ঞতা আর মুকাল্লিদ হল অজ্ঞ। তাকলীদে মুতলাক, যেটা আপনাদের নিকট ওয়াজিব, সেখানেও তো তাকলীদ আছে। তাহলে তাকলীদে মুতলাক ওয়াজিব হওয়ার অর্থ কী হবে– অজ্ঞ থাকা ওয়াজিব আর তাহকীক করা হারাম?

৬১. একদিকে আহলে হাদীস বন্ধুরা বলে থাকে– তাকলীদ মানে হল কোরআন-হাদীস বর্জন করে উম্মতের কারো কথা মতে আমল করা। আবার তারাই বলে তাকলীদে মুতলাক ওয়াজিব। তাহলে ফলাফল কী দাঁড়াল- কোরআন-হাদীস বর্জন করা ওয়াজিব। এটা কি আপনাদের অন্তরের বিশ্বাস?

৬২. একদিকে আহলে হাদীস তাকলীদকে বলে অভিশাপ। অপর দিকে তাকলীদে মুতলাককে বলে ওয়াজিব। ফলে আহলে হাদীসের সাধারণ সদস্যরা তাকলীদ নামক অভিশাপের বেড়ী গলায় ঝুলাতে বাধ্য হয়। কেননা, গলায় না ঝুলালে যে ওয়াজিব তরকের গুনাহ হবে।

৬৩. তারাতাকলীদকে শিরকও বলে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল শিরকের এক কিসিম তাকলীদে মুতলাককে আবার ওয়াজিবও বলে থাকে। (মুশরিক হওয়া কি ওয়াজিব?)

৬৪. আহলে হাদীস বন্ধুরা বলে- নির্দিষ্ট এক ইমামের তাকলীদ শিরক। কিন্তু চার ইমামের তাকলীদে মুতলাক ওয়াজিব। শিরক আর ওয়াজিবের রহস্যটা কি রাসূল সা. এর কোন সহীহ, সরীহ হাদীস থেকে দেখাবেন?

৬৫. (আহলে হাদীস চার ইমামকে চার মূর্তি বলে অভিহিত করে।) এক মূর্তিকে সিজদা করলে শিরক হয়। অথচ চার মূর্তিকে বার বার সিজদা করা ওয়াজিব। হাদীসে সহীহ, সরীহ থেকে দেখান তো!

৬৬. তাদের নিকট নির্দিষ্ট এক ইমামের সকল ইজতিহাদ মান্য করা শিরক। কেননা তাহলে তাঁকে সমস্ত ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বেমনে করা হয়। আর কোন মানুষের ক্ষেত্রে এমন আকীদা পোষণ করা শিরক। প্রশ্ন হল- বুখারী শরীফের সমস্ত হাদীসকে সহীহ মনে করা হলে, ইমাম বুখারী রহ. কে সকল ভুলের উর্ধ্বে মনে করা হয় না?

৬৭. কোন কোন আহলে হাদীস বলে থাকেন– তাকলীদ শব্দটি ব্যবহার করাই জায়েয নেই। কোন হাদীসে আপনার এ দাবী সমর্থন আছে? সহীহ, সরীহ, বিরোধহীন হাদীস পেশ করুন। আচ্ছা! বলুন তো তাকলীদে মুতলাক ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ, সরীহ হাদীস আছে কি?

৬৮. কোন কোন অজ্ঞ সাহেব (!) বলেন– তাকলীদ শব্দটি এ অর্থে কোরআন-হাদীসে ব্যবহৃত হয়নি। এজন্য নাজায়েয। আচ্ছা! তাহলে বলুন তো উসূলে হাদীসের শব্দাবলী, হাদীসের প্রকারসমূহ, জারাহ তা'দীলের পরিভাষাসমূহ প্রচলিত অর্থে কোরআনের কোন আয়াতে কিংবা রাসূলের কোন হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে? যদি উত্তর না বোধক হয়, তাহলে বলুন তো প্রচলিত অর্থে ঐসব শব্দের ব্যবহার জায়েয না নাজায়েয? হালাল না হারাম?

৬৯. যদি তাকলীদ শব্দটি প্রচলিত অর্থে কোরআন-হাদীসে কোথাও না থাকে, তাহলে শিরক ও হারামের এ বিধান আপনারা কোত্থেকে আবিষ্কার করলেন?

৭০. কোন কোন আহলে হাদীস বলে চার ইমামের নাম হাদীস থেকে দেখাও। আচ্ছা! তাহলে আপনি হাদীসের ছয় ইমামের নাম হাদীস

থেকে দেখান। (থাক, শুধু ইমাম বুখারীর নামটা হাদীস থেকে দেখান।)

৭১. কেউ কেউ বলেন হেদায়া, কুদুরী, আলমগীরির নাম হাদীস থেকে দেখাও। আপনি তাহলে সিহাহ সিত্তার নাম হাদীস থেকে দেখান না!

৭২. আল্লাহ তায়ালা যখন ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন- তোমরা আদমকে সিজদা কর, সবাই সিজদা করল। এটা আল্লাহর নির্দেশ ছিল। ফিরিশতারা দলীল ত্বলব ব্যতীত সবাই সিজদা করলেন। এটার নাম তাকলীদ। কিন্তু ইবলিস মহাশয় (!) বেঁকে বসল। দলীল ছাড়া সিজদা করতে মন তাকে সায় দিল না। পরিণামে কী হল? তাকলীদের হার তার গলায় শোভা পেল না। আজীবনের জন্য সে লা'নাতের শিকলে আবদ্ধ হল।

৭৬. শয়তান যে দাবী (أنا خيرمنه) করেছিল, সে দাবী আজ বন্ধুরাও করছে। আপনি সাহাবাদের কোন কথা, কোন আমল পেশ করুন, দেখাবেন বলে উঠবে أناخيرمنه (সাহাবাদেরকে মানব কেন? আমি কম নাকি?)

৭৪. শয়তান কী ছিল– মুকাল্লিদ না গায়রে মুকাল্লিদ? যদি মুকাল্লিদ হয় কোরআন-হাদীসের আলোকে বলুন– সে কার মুকাল্লিদ ছিল?

৭৫. কোন কোন লা-মাযহাব আহলে হাদীস বলে শয়তান কিয়াস করেছিল যেরকম মুজতাহিদীন করে। তাহলে কুরআনের দলীলের আলোকে বলুন শয়তান কি বাস্তবেই মুজতাহিদ ছিল?

৭৬. শয়তান যদি মুজতাহিদ হয়, তার গলায় লা'নতের আজাব নয়; বরং বুখারী শরীফের হাদীসের আলোকে এক আজর বরাদ্দ হওয়ার কথা। বলুন সে কি এক আজর (পুন্য) পেয়েছে?

৭৭. ইমাম চতুষ্টয় আপনাদের নিকট কি শয়তানের মতই অভিশপ্ত? না আরো বেশী? কেননা, শয়তান তো এক মাসআলায় কিয়াস করেছে। আর ইমাম চতুষ্টয় করেছেন লাখো মাসআলায়। সহীহ, সরীহ, বিরোধহীন হাদীসের আলোকে জওয়াব দিন।

৭৮. শয়তান কিয়াসের কারণে গুনাহের সাগরে ডুবে গেল। তবে তার তাকলীদ করা হয়নি। কিন্তু ইমামগণ লাখো কিয়াস করেছেন। কোটি মানুষ তাদের তাকলীদ করেছে এবং করছে। এ সমস্ত মুকাল্লিদীনের গুনায় ইমামগণ শরীক থাকবেন, না থাকবেন না?

৭৯. নির্দিষ্ট এক ইমামের তাকলীদ করা হারাম। আপনাদের এ দাবীর পক্ষে কুরআনের কোন আয়াত কিংবা সহীহ, সরীহ, বিরোধহীন কোন হাদীস পেশ করুন। যদি না পারেন, তবে নিজেদের পক্ষ থেকে কোন কিছুকে হালাল কিংবা হারাম বানানো ইয়াহুদী-নাসারাদের ধর্মগুরুদের তাকলীদ নয় কি?

৮০. তাকলীদে শখছী থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক মাসআলায় ইমাম পরিবর্তন করা কি ফরয? অর্থাৎ– কোন মাসআলা এক ইমামের থেকে জিজ্ঞাসা করার পর আরেকটি মাসআলা তার থেকে জিজ্ঞাসা করা হারাম। শরীয়তের বিধান কি এরকম? এরকম হলে কুরআনের আয়াত কিংবা সহীহ, সরীহ, বিরোধহীন হাদীস পেশ করুন।

৮১. না অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা ফরয। অর্থাৎ একদিন এক ইমাম থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা ফরয। এরপরের দিন ঐ ইমামের থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হারাম। অন্য আরেক জনের থেকে জিজ্ঞাসা করা ফরয। আবার তৃতীয় দিন প্রথম দু'জনের থেকে জিজ্ঞাসা করা হারাম। তৃতীয় আরেক জনের থেকে জিজ্ঞাসা করা ফরয। মোট কথা, তাকলীদে শখছীর লা'নত থেকে বাঁচার জন্য প্রতিদিন ইমাম পরিবর্তন করা ফরয। যদি এমন হয়, কুরআনের আয়াত কিংবা সহীহ, সরীহ, বিরোধহীন হাদীস থেকে দলীল পেশ করুন।

৮২. না মাস হিসাবে সময় নির্ধারণ করবেন। এক মাস একজনের থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করবেন। পরের মাস আরেক জনের থেকে। এভাবে প্রতি মাসে ইমাম পরিবর্তন করবেন। আচ্ছা, এমন হলেও দোষের কিছু নেই যদি কোরআন অথবা সরীহ, সহীহ ও বিরোধহীন হাদীস থেকে দলীল পেশ করতে পারেন।

৮৩. নামাযে কিরাআত পড়া ফরয। কুরআনের সাত কিরাআত আছে। সাতও কিরাআত শিখা ফরয হবে। প্রত্যেক কিরাআত নামাযে পড়া ফরয হবে। যদি এরকম হয় তাহলে বলুনতো নামাযে কিরাআতের ফরয আদায় করার জন্য যদি কেউ সারা জীবন, এক কিরাআতই পড়ে, সে কাফের হয়ে যাবে না মুশরিক? না তার কাজটিই হারাম হয়ে যাবে?

৮৪. মুতাওয়াতির কিরাআত ৭টি। কিরাআত পড়া ফরয। তাহলে সাত কিরাআত পড়াও ফরয। আচ্ছা কেউ যদি এক কিরাআতে নামায শেষ করে, তার কিরাআতের কতটুকু ফরয আদায় হল? পুরা ফরয না সাত ভাগের একভাগ?

৮৫. আচ্ছা-কোন মহিলা যদি বলে নিকাহ তো সুন্নত। কিন্তু সারা জীবন একই পুরুষের অধীনে থাকা হারাম। কারণ এটা তো তাকলীদে শখছীর মতই। (তখন আপনি কী বলবেন? হাদীসের আলোকে বলুন। তাবীল করবেন না কিন্তু!)

৮৬. আহলে হাদীস বন্ধুদের নিকট নিকাহও জায়েয। মুতয়াও জায়েয। প্রশ্ন হল- যদি কোন মহিলা আহলে হাদীস শুধু বিবাহ করেই ক্ষান্ত হয়, পুরো জীবনে মুতয়া সংক্রান্ত হাদীসগুলোর উপর আমল না করে, সে কি গুনাহগার হবে?

৮৭. যদি কোন মহিলা আহলে হাদীস একমাস বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, পরের মাস মুতয়া করে জিন্দেগী গুযরান করে, এভাবে পালাক্রমে মুতয়া ও নিকাহ উভয় প্রকারের হাদীসসমূহের উপর আমল করে সে প্রথম মহিলার থেকে কী পরিমাণ বেশী পুণ্যের অধিকারী হবে?

৮৮. কোরআনে এসেছে واتبع ملة إبراهيم حنيفا অত্র আয়াতে حنيف কে উত্তমগুণ বিবেচনা করা হয়েছে। হানীফ যে রকম একমুখী হয়, তাকলীদে শখছীর পাবন্দরাও একমুখী হয়। আয়াত থেকে বুঝা গেল- একমুখী হওয়া আল্লাহ তা'য়ালার নিকট খুবই পছন্দনীয়। তাহলে আপনাদের এত আপত্তি কেন?

৮৯. এতো গেল একমুখী হানীফদের কথা। দ্বিমুখী অ-হানীফদের সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন– إن شرالناس يوم القيامة ذو الوجهين নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন সর্বনিকৃষ্ট মানুষ দ্বিমুখী ব্যক্তি।
তাকলীদে শখছী মানুষকে দ্বিমুখীত্ব থেকে বিরত রাখে। আর তাকলীদে গায়রে শখছীর সাথে যখন প্রবৃত্তির অনুসরণ ও সহজ অনুসন্ধানের প্রবণতা যুক্ত হয়, তখন তা মানুষকে দ্বিমুখী বানিয়ে ছাড়ে। আপনারা দ্বিমুখী হতে এত পছন্দ করেন কেন?

৯০. পবিত্র কোরআন কাফেরদের কর্ম পদ্ধতি বর্ণনা করেছে এভাবেيحلونه عاما ويحرمونه عاما তারা উহাকে এক বছর হালাল সাব্যস্ত করে, আরেক বছর হারাম সাব্যস্ত করে।
তাকলীদে শখছী মানুষকে এ বিদআত থেকে বাঁচায়। আর তাকলীদে গায়রে শখছীর সাথে প্রবৃত্তি পুঁজার প্রবণতা যুক্ত হলে তা মানুষকে এ বিদআতে অভ্যস্ত করে তোলে।

৯১. রাসূল সা. মুনাফিকদের অভ্যাস ও চরিত্র বয়ান করতে গিয়ে বলেন– لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء এ দিকেও না, ও দিকেও না।
আরো বলেন– كالشاة العائرة بين الغنمين ঐ বকরীর মত, যে দু'পাল বকরীর মাঝে ঘুরপাক খায়।
তাকলীদে শখছী মানুষকে এ মুনাফিকসুলভ অভ্যাস থেকে বিরত রাখে। আর তাকলীদে গায়রে শখছী মানুষকে এ বিদআতে বাধ্য করে।

৯২. মুজতাহিদীনের তাকলীদে শখছীর ভিত্তি এ সুধারণার উপর (যে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত ফাকাহাত দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন)। আর আনাড়ী গায়রে মুজতাহিদের তাকলীদে শখছীর ভিত্তি সলফ ও প্রকৃত মুজতাহিদীন সর্ম্পকে কুধারণার উপর। (অর্থাৎ সকলের নিকট স্বীকৃত মুজহাহিদগণ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হননি। হয়েছে আহলে হাদীসের আনাড়ী মুজতাহিদরা। এজন্য তাদের তাকলীদই করতে হবে।) অথচ প্রকৃত মুজতাহিদ সম্পর্কে সুধারনেই কাম্য ছিল। আর আনাড়ী মুজতাহিদের তাকলীদ? এতো হতেই পারে না।

৯৩. গায়রে মুকাল্লিদ আহলে হাদীস বন্ধুরা সাধারণত মুকাল্লিদীনকে গলায় রশিবাঁধা কুত্তা বলে থাকে। এর অর্থ কী- গায়রে মুকাল্লিদ বাঁধনমুক্ত কুত্তা? যদি তাই হয়, তবে শুনুন। বাঁধা কুত্তা তো হয় গৃহপালিত। তার খোরনোশের বন্দোবস্ত গৃহকর্তাই করে। তার সব প্রয়োজন পূরণের চিন্তা মালিকের। তাকে দুধ, রুটি , ঘীসহ আরো অনেক কিছু খাওয়ায়। আর ছাড়া কুত্তা (?) ঘরওয়ালা তাকে শুধু তাড়ায়। দুধ-রুটিতো দূরের কথা। জীবন বাচানোর খাবারও জোটেনা। শেষ পর্যন্ত অপারগ হয়ে চৌর্যবৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করে। এ বাড়ীতে ঝাটা পিটা তো ও বাড়ীতে লাঠি পিটা। গৃহপালিত হওয়া তো দূরের কথা এমন গৃহতাড়িত যে, দরজার কাছে যাওয়াও সম্ভব হয়না। চারিদিক থেকে লাঠি পিটা আর তাড়া খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে দুর্গন্ধ আর নাপাকি চেটে। আশ্রয় খুঁজে ড্রেন আর নর্দমার নোংরা পরিবেশে। (বন্ধু! আমরা ওরকম হলে আপনারা এরকম হবেন না কেন?)

৯৪. মুনকিরীনে হাদীস (হাদীস অস্বীকারকারী) বলে– হাদীস হুজ্জত। তবে খবরে ওয়াহেদ হুজ্জত নয়। আহলে হাদীসের অবস্থাও অনুরূপ। তারাও বলে তাকলীদে মুতলাক হুজ্জত ঠিকই; কিন্তু তাকলীদে শখছী হুজ্জত নয়। উভয় জনের পথতো একটাই। কী বলেন- পার্থক্য আছে নাকি?

৯৫. তাকলীদে শখছী যদি হারাম হয়, কোন আহলে হাদীসের কিতাব লিখার অধিকার থাকবেনা। কেননা, তার কিতাবের বিষয়বস্তু, মাসআলাসমূহ তার তাহকীকে শখছী, ব্যক্তিগত বিচার-বিশ্লেষণ। তাকলীদে শখছী হারাম হলে কিতাব লিখে তাহকীকে শখছীর প্রতি লোকদেরকে দাওয়াত দেয়ার কী অধিকার আছে? আর আওয়াম আহলে হাদীসেরই বা তাহকীকে শখছী অনুযায়ী আমল করার কী অবকাশ আছে?

৯৬. তাকলীদে শখছী হারাম হলে আহলে হাদীসের জন্য বয়ান-বক্তৃতা করাও জায়েয হবে না। চাই দরসে হোক কিংবা ময়দানে বা মসজিদে। আর শ্রোতাদের জন্যও এসব গলধ করণ করা বৈধ

হবে না। বক্তা তাহকীকে শখছী বিতরণ করছে। আর শ্রোতা চোখ বুঝে গিলছে। একেমন কথা?

৯৭. যদি তাকলীদে শখছী এজন্য শিরক ও হারাম হয় যে, মুজতাহিদ মা'সুম ও নির্ভুল নন। তাহলে চারজন গায়রে মা'সুম ও ভুলসমৃদ্ধ ইমামের পালাক্রমিক তাকলীদ কীভাবে শুদ্ধ হবে?

৯৮. যদি মুজতাহিদের তাকলীদে শখছী এজন্য হারাম হয় যে, মুজতাহিদ মা'সুম নন। হাদীসের বর্ণনাকারীগণও তো মা'সুম নন। তাদের বর্ণিত হাদীস কিভাবে হুজ্জত হতে পারে?

৯৯. যদি মুজতাহিদের তাকলীদে শখছী এজন্য হারাম হয় যে, তারা মা'সুম নন, হাদীসের ক্ষেত্রে তো মুহাদ্দেসীনের তাসহীহ ও তাযয়ীফ (সহীহ-যয়ীফ বলে মান নির্ণয়)ও তো তাদের মতের উপর নির্ভরশীল। তারাও তো মা'সুম নন। তাদের মত মান্য করা শিরক ও হারাম হবেনা কেন?

১০০. ফিকহকে যদি এজন্য তরক করা হয় যে, তা ظنی বা ধারণা নির্ভর। তাহলে ফিকহর اجماعی مسئلہ বা সকল মুজতাহিদ কর্তৃক স্বীকৃত মাসআলা কেন বর্জন করা হবে? ইজমা তো ভুল-ত্রুটিমুক্ত। ইজমা তরককারীর হুকুম কী হবে?

হাদীসে মুতাওয়াতিরের সংখ্যাতো অনেক কম। অধিকাংশই খবরে ওয়াহেদ। যা ظن বা প্রবল ধারণা সৃষ্টি করে। তাহলে এ ظن কেন কবুল করা হবে?

এসকল প্রশ্নের উত্তর আহলে হাদীস বন্ধুদের জিম্মায় থাকল।

‘মাযহাব ও নামায সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা’

মূল:

আল্লামা মোস্তফা নোমানী দা. বা.

সংকলন:

রুহুল্লাহ নোমানী

লিখক ও কিতাব সম্পর্কে

আল্লামা মোস্তফা নোমানী দা.বা.। দক্ষিণ বঙ্গের সর্বজন স্বীকৃত আলেম। এ পর্যন্ত তাঁর ১২টি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। সবগুলো কিতাবই ব্যাপক সমাদৃত ও প্রশংসিত। একশত মাসআলা শিক্ষা (চতুর্থ খন্ড) এর মধ্যে অন্যতম। কয়েক বছর পূর্বে আহলে হাদীসের অহেতুক উৎপাতে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে তিনি উক্ত কিতাবের শুরুতে মাযহাব ও নামায সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা লিপিবদ্ধ করেন। আলহামদু লিল্লাহ সে অশান্তি দূর হয়ে গেছে। বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকায় তা বক্ষমান কিতাবটির সাথে সংযুক্ত করা হল। আশা করি পাঠক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা এবং উদ্ভুত পরিস্থিতিতে করণীয় সর্ম্পকে একটি সুন্দর দিক নির্দেশনা পাবেন।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা মোস্তফা নোমানী দা.বা. একই সাথে দু’টি প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। একদিকে হানাফী নামধারী এক দল বিদআতী, যারা ধর্মকেই বিকৃত করে ছেড়েছে। অপর দিকে মাযহাব বিদ্বেষী একদল আহলে হাদীস। যারা হাদীসের প্রথম শ্রোতা ও ধারক সাহাবায়ে কেরামকে নাজেহাল করে চলছে। তিনি বলেন- আহলে হাদীস আন্দোলন যে একটি ফিৎনা, আহলে হাদীস যে চরম বে-আদব, তা বুঝার জন্য এতকুটুই যথেষ্ট যে, তারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি চরম শ্রদ্ধাহীন। যে সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তাঁর নবীর সহযোগী হিসাবে নির্বাচন করেছেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ আপন সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন- আহলে হাদীস তাদেরকে দলীল মানতে নারাজ। বরং তাদের প্রতি কটুক্তি করতে অভ্যস্ত। তিনি বলেন- রাসূল সা. পর্যন্ত যে দলের সিলসিলায়ে সাহাবায়ে কেরাম অনুপস্থিত সে দল আহলে হক, আহলে হাদীস কোনটাই হতে পারেনা। কারণ আমরা হক-হাদীস উভয়টাই সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে পেয়েছি।

তিনি আক্ষেপ করে বলেন- এক শ্রেণীর বেদআতী, আহলে হাদীসের প্রপাগান্ডার সুযোগ করে দিচ্ছে। আহলে হাদীস- তাদের কবর পুজা, মাজার পুজার কালিমা হানাফীদের গায়ে লেপন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এজন্য দু’দলকেই প্রতিহত করা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমরা যতটা অবহেলা করব, তারা তত সুযোগ নিবে; মানুষ তত বিভ্রান্ত হবে। তাই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সঠিক হানাফী মসলক তুলে ধরা, বে-আদব আহলে হাদীস ও বদ-দ্বীন আহলে বিদাআত সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা সময়ের দাবী। তিনি তাঁর এ দরদী চিন্তাধারার উপর নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আল্লাহ আমাদেরকেও তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত
রুহুল্লাহ নোমানী

মাযহাব সংক্রান্ত

মাসআলাঃ "মাযহাব মানা ফরজ"এর দলীল কী?

মাযহাব মানাকে তাকলীদ (تقليد) বলা হয়। এ তাকলীদ সম্পর্কিত একটি আয়াতকে পবিত্র কোরআনের দু'টি সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতটি হল- فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

যদি তোমরা না জান, তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর।

(সূরা নাহল/৪৩, সূরা আম্বিয়া/৭)

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের বিধি-বিধান জানে না, এরূপ মুর্খ ব্যক্তিদের উপর আলেমদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তারা আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তদানুযায়ী আমল করবে।

তাফসীরে মাআরেফুল কোরআনে মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. (মৃত্যু ১৯৭৬ ঈসায়ী, করাচী, পাকিস্তান) সূরা নাহলের এ আয়াতের তাফসীরে লিখেন- فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

এ বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এজাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল করে। তাই কোরআনী বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ, যুক্তিগত ও ইতিহাসগত বিধি হলো, যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখেনা, তারা যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবে এবং তাদের কথা মত কাজ করা জ্ঞানহীনদের উপর ফরয হবে। একেই তাকলীদ (অনুসরণ) বলা হয়। এটা কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগত ভাবেও এ পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ কর্মকে ব্যাপক করার আর কোন উপায় নেই। সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনরূপ মাতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত হয়ে আসছে। যারা তাকলীদ অস্বীকার করে, তারাও এ তাকলীদ অস্বীকার করে না যে, যারা আলেম নয়, তারা আলেমদের কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে কাজ করবে।

বলা বাহুল্য, আলেমরা যদি অজ্ঞ জনসাধারণকে কোরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবুও তারা এগুলোকে আলেমদের উপর আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে। কারণ, তাদের নির্দেশকে শরীয়তের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই তো তাকলীদ। এ তাকলীদ যে বৈধ বরং জরুরী, তাতে কোনরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই।

মাসআলাঃ আলেমের জন্যও কি মাযহাব মানা ফরজ?

প্রশ্নঃ যায়দ বলছে যে, কোরআন শরীফের আয়াতঃ

فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (سورة النحل ـــــ ٣٤)

(তোমরা যদি না জান, তবে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা কর।) এখানে 'তোমরা যদি না জান' কথাটি দ্বারা শুধু মুর্খ জনসাধারণকে মাযহাব মানার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আলেমদের জন্য মাযহাব মানার নির্দেশ দেয়া হয়নি। অতএব আলেমের জন্য মাযহাব মানা ফরজ নয়।

উত্তরঃ ধরুন, আপনার দেহে রোগ হয়েছে। উপযুক্ত চিকিৎসা যদি আপনার জানা থাকে, তাহলে আপনাকে কেউই অন্য চিকিৎসকের তাকলীদ করতে বলবে না। কিন্তু চিকিৎসা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের তাকলীদ করা, মানে তার নিকট জিজ্ঞাসা করে নিজের চিকিৎসা করা আপনার উপর ফরজ হয়ে যাবে। ঠিক তদ্রুপ শরীয়তের বিধি-বিধান যতটুকু আপনার জানা থাকবে, ততটুকুতে আপনার মাযহাব মানার দরকার নেই। কিন্তু যেখানে আপনার ইলম সমাধান দিতে ব্যর্থ হবে, সেখানে তাকলীদ মানে মাযহাব মানা ছাড়া উপায় নেই। সাহাবায়ে কেরাম রা. পর্যন্ত এরূপ ক্ষেত্রে একে অপরের নিকট জিজ্ঞাসা করেছেন, মানে সাধারণ সাহাবীরা বিজ্ঞ মুজতাহিদ সাহাবীদের তাকলীদ করেছেন। যদিও মাযহাব, ইমাম এবং ফিকহ শাস্ত্রের ফরজ, সুন্নত, ওয়াজিব, কিয়াস ইত্যাদি পরিভাষা সাহাবী ও তাবেয়ীনের যুগে প্রসার লাভ করেনি, যা হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে ব্যাপকতা লাভ করে। কিন্তু পবিত্র কোরআনের তাকলীদের নির্দেশ তাঁরা মেনে চলেছেন।

অতএব যেসব বিধান পরিষ্কারভাবে কোরআন ও হাদীসে উল্লেখ নেই অথবা যেগুলিতে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে আয়াত কিংবা হাদীসের অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে- এসব ক্ষেত্রে নিজে মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক আলেমের পক্ষেও কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করা জরুরী। ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে এক আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে জায়েয নেই।

মাসআলা: সাহাবায়ে কেরাম রা. কি মাযহাব মানতেন?

প্রশ্নঃ যায়দের দাবী হল, সাহাবা ও তাবেয়ীদের আমলে মাযহাব ছিল না। মাযহাবের প্রচলন হয়েছে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে। তাহলে বুঝা গেল সাহাবী ও তাবেয়ীরা সবাই লা-মাযহাবী ছিলেন। তাই যদি হয় তাহলে আমরা মাযহাব মানব কেন?

উত্তরঃ যায়দের দাবী সত্য নয়। মাযহাব মানার অর্থ হল ইজতিহাদী মাসআলাগুলিতে অন্যের তাকলীদ করা। সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে মাযহাব শব্দটির প্রচলন না হলেও তাঁরা যে মুজতাহিদ সাহাবীদের তাকলীদ করতেন তার প্রমাণ আছে। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. 'ইযালাতুল খফা' (إزالة الخفاء) নামক কিতাবে বলেন ঃ

وفي الجملة طريق مشاورت در مسائل اجتهاديه وتتبع احاديث ازمظان آن كشاده شد معهذا بعد عزم خليفه برچيزے مجال مخالفت نبود وبدون استطلاع رائے خليفه كارے را مصمم نمي ساختند لهذا درين عصر اختلاف مذهب وتشتت آراء واقع نه شد همه بريک مذهب متفق وبريک راه مجتمع وآن مذهب خليفه ورائے آن بود روايت حديث وفتوي وقضاء ومواعظ مقصور بود در خليفه-

মোটকথা ইজতিহাদী মাসআলাগুলিতে পরস্পরে পরামর্শ করা এবং তদ্বিষয়ের হাদীস তালাশ করার পথ খোলা ছিল। তা সত্ত্বেও কোন বিষয়ে খলীফার রায় জানা ব্যতিরেকে কোন কাজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হত না।

অতএব সে যুগে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব ও ভিন্ন ভিন্ন রায় থাকতে পারত না। সবাই একই মাযহাবের উপর একমত এবং একই পথের উপর একতাবদ্ধ। সে মাযহাব খলীফার মাযহাব এবং সে রায় খলীফার রায় হত। হাদীসের বর্ণনা ফতোয়া, বিচার ও ওয়াজ-উপদেশ দান প্রভৃতি সবই খলীফার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

মুফতী রশীদ আহমাদ রহ. (মৃত্যু ২০০২ ঈসায়ী, পাকিস্তান) তাঁর আহসানুল ফাতাওয়া ১ম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আলোচনার পর লিখেনঃ

এ ব্যাপারে (সাহাবীদের মাযহাব মানার) আমরা আরও দু'টি প্রমাণ পেশ করছি। যথা- (ক) হযরত উমর রা. এর জারীকৃত আইন (খ) **خير القرون** বা উত্তম যুগে মদীনা বাসীদের আমল। কোন সাহাবী কর্তৃক হযরত উমর রা. এর এই আইন ও মাদীনাবাসীদের এই আমলের বিরোধিতা না করা **تقليد شخصي** তথা ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণ করা বা মাযহাব মানার উপর সাহাবীদের ইজমা হওয়ার প্রকৃষ্ট দলীল।

উমর রা. এর জারীকৃত আইনঃ

আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম রচিত **إعلام الموقعين** এবং ইমাম দারেমী রচিত **سنن** কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর রা. এ আইন জারী করেন যে, যে মাসয়ালায় রসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস পাওয়া যাবে না সে ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর রা. এর ফতোয়ার উপর আমল করতে হবে। যদি হযরত আবু বকর রা. এর ফতওয়া না পাওয়া যায় তাহলে আলেমদের পরামর্শের দ্বারা যে রায় গৃহীত হবে সে রায় কার্যকর করতে হবে।

হযরত উমর রা. এর এ ফয়সালার দ্বারা নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির তাকলীদ করার (**تقليد شخصي** তথা মাযহাব মানার) গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করুন। তিনি নিজে একজন মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ এবং যাবতীয় গুণাবলীর পরিপূর্ণ অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও জীবনভর হযরত আবু বকর রা. এর তাকলীদ করেছেন এবং তাঁর ফতওয়া মোতাবেক রায় দিয়েছেন।

মদীনাবাসী এবং তাকলীদে শখ্সীঃ

روى البخارى فى (باب إذا خاضت المرأة بعد ما أفاضت) عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لانأخذ بقولك وندع قول زيد (الى قوله) رواه خالد وقتادة عن عكرمة قال الحافظ رحمه الله تعالى زاد الثقفى فقالوا لا نبالى افتيتنا او لم تفتنا، زيد بن ثابت يقول لا تنفر، وفى وراية قتادة فقالت الأنصار لانتبعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا (فتح البارى –ج ٣– ص – ٤٦٨)

ইমাম বুখারী রহ. **إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت** শিরোনাম দিয়ে আইয়ুব থেকে, ইকরামা থেকে বর্ণনা করেন যে, মদীনাবাসীরা ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞাসা করল যে, জনৈকা মহিলা তাওয়াফ করেছে। অতঃপর তার হায়েজ হয়েছে। (এখন সে মহিলা হজ্জের কাজ করবার জন্য বের হবে কি হবে না?) তিনি উত্তর দিলেন, বের হবে। মদীনাবাসীরা বললেন, আমরা যায়দ বিন সাবিত রা. এর কথা বাদ দিয়ে আপনার কথা গ্রহণ করব না। (একথা খালিদ ও কাতাদাহ ইকরামা থেকে বর্ণনা করেন)

হাফেজ রহ. ছাকাফী সূত্রে আরও বর্ণনা করেন যে, মদীনাবাসীরা বললেন, আপনি ফতোয়া দেন আর নেই দেন আমরা তার পরোয়া করব না। যায়দ বিন সাবিত বলেছেনঃ সে (মহিলা) বের হবে না।

কাতাদার বর্ণনায় আছে, আনসার সাহাবীরা বললেন, হে ইবনে আব্বাস! আমরা আপনার অনুসরণ করব না, আপনি যায়দের বিপরীত রায় দিচ্ছেন। (ফাতহুল রাবী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৮)

এ রেওয়াতের দ্বারা এক দিকে এ কথা প্রমাণিত হল যে, মদীনাবাসীরা হযরত যায়দ বিন সাবিত রা. এর **تقليد شخصى** করতেন (বা তার মাযহাব মেনে চলতেন)। অন্যদিকে এটাও জানা গেল যে, এ কারণে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বা অন্য কোন সাহাবী এ মুকাল্লিদের বা (মাযহাব পালনকারীর) বিরুদ্ধে শিরক বা কবীরা গোনাহর কোন ফতোয়া দেননি।

ফায়দাঃ

উপরের আলোচনা দু'টির দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সাহাবারা ইজতিহাদী মাসআলাগুলির ক্ষেত্রে সমকালীন খলীফাদের মাযহাব মেনে চলতেন। খলীফার মাযহাবের বাহিরে কারো কোন ফতোয়া দেয়ার অধিকার ছিল না। এমনকি তাঁর অনুমতি ব্যতীত মিম্বরে দাঁড়িয়ে কিছু বলাও কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাজধানীতে খলীফার যে মর্যাদা ছিল অন্যন্যা শহরে খলিফার প্রতিনিধি শাসকদেরও সেই একই মর্যদা ছিল। ফলে খিলাফতের এ আমলে মুসলামানদের মাযহাব এক ছিল, মাযহাবের ইমামও এক ছিল। অর্থাৎ স্বয়ং খলীফাই মুসলামানদের যাবতীয় ইজতিহাদী মাসয়ালার একমাত্র উত্তরদাতা ছিলেন। ফলে তাদের আমলে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব হতে পারেনি। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, সাহাবারা ইজতিহাদী মাসআলাগুলির ক্ষেত্রে **تقليد شخصى** করতেন না।

ভাইয়েরা, এরপরও যদি কেউ মাযহাবপন্থীদেরকে গালাগালি দেয়, তাদের নামায বাতিল করে দেয় এবং মাযহাব মানার কারণে মুশরিক বলে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে **إنا لله وإنا إليه راجعون** পড়া ছাড়া উপায় কী!

মাসআলা: ‘নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মানা ফরজ’ পবিত্র কোরআনে এ কথার দলীল কী?

নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মানাকে **تقليد شخصى** বলা হয়। তাকলীদে শাখ্ছী পবিত্র কোরআনের এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত–

فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (سورة النحل ـــــ ٣٤)

তোমরা যদি না জান, তবে যারা জানে তাদের থেকে জিজ্ঞাসা কর। (সুরা নাহল ৪৩)

অত্র আয়াতে আহলে যিকর বলতে মুজতাহিদ আলেমদেরকে বুঝানো হয়েছে। দেহের চিকিৎসার জন্য অনেক চিকিৎসকের মধ্য হতে আস্থার ভিত্তিতে যেমন একজনকে নির্বাচন করা হয়, তেমনি রূহের চিকিৎসার

জন্য অনেক আলেমের মধ্য হতে আস্থার ভিত্তিতে একজনকে নির্বাচন করতে হয়। এটাই যুক্তির কথা। আল্লাহর কালামের তাৎপর্যও তাই। একাধিক চিকিৎসকের দ্বারা একই সময়ে চিকিৎসা করালে রুগীর অবস্থা করুণ হতে বাধ্য। ঠিক তদ্রুপ একাধিক মাযহাব মানলে সাধারণ মানুষ দুনিয়ার লোভ ও মোহে পড়ে আল্লাহর দ্বীন ছেড়ে নিজের নফসের তাবেদারী বা অনুসারী হয়ে পড়বে। এ জন্যই নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মানতে হবে। দেখুন, সাহাবায়ে কেরামও রাসূলুল্লাহ সা. এর ইন্তেকালের পর ইজতিহাদী মাসআলার ক্ষেত্রে এক খলীফার তাকলীদ করেছেন। মাদীনাবাসী আনসারগণও এক হযরত যায়দ বিন সাবিত রা. এর তাকলীদ করেছেন। এতে সাধারণ মানুষ নফসের অনুকরণ করার সুযোগ পায় না। ফলে দ্বীনের শৃঙ্খলা রক্ষা পায়।

একাধিক মাযহাব মানলে বা মানার অনুমতি দিলে মানুষের ধর্ম পালন একটা খেলনার বস্তুতে পরিণত হতে বাধ্য। এদিকে ইংগিত দিয়ে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. (মৃত্যু ১৯৪৩ ঈসায়ী, দেওবন্দ, ভারত) বলেন–

এধরণের ক্রিয়াকর্মকে প্রশ্রয় দেয়া হলে ধর্মকে তামাশার বস্তুতে পরিণত করার বিস্তর সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে। প্রতিটি ব্যাপারেই কোন না কোন মাযহাবে আত্মতুষ্টিমূলক বিধান তো পাওয়া যাবেই। তাই বলে, নিজের সুবিধামত মাযহাবের অনুসরণ কি প্রবৃত্তি পূজার সমর্থক হবে না?

উদাহরণস্বরূপঃ বলা যায়, মনে করুন জনৈক অযু বিশিষ্ট ভদ্রলোকের শরীর থেকে রক্ত নির্গত হলে তাকে বলা হলো আমাদের মাযহাব মতে তো আপনার অযু নষ্ট হয়ে গেছে, আবার অযু করে আসুন। ভদ্রলোকটি জবাবে বললেন, এক্ষেত্রে আমি ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাযহাব অনুসরণ করব। অতএব আর অযু করার প্রয়োজন নেই। অল্পক্ষণ পরে ঐ ভদ্রলোকটিই সবেগে কোন মহিলার শরীর স্পর্শ করলে তাকে বলা হলো, এবার তো শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ীই ও আপনার অযু ফাসিদ হয়ে গেছে। ভদ্রলোক জবাব দিলেন, এখন আমি আবার হানাফী মতাবলম্বী হয়ে গেছি। কাজেই অযু শোধরানো দরকার হবে না। বড়ই পরিতাপের বিষয়, একই অযুর পর শরীর থেকে রক্ত নির্গত হওয়া ও

সবেগে নারী স্পর্শ করা- এ উভয় কারণ মিলিত হওয়ার দরুণ সকল মাযহাব অনুসারেই ভদ্রলোক অযু না করে অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করে আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করছেন। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের অনুসরণ ধর্মে-কর্মে এমন ধরনের হাজারো দুস্কৃতির উদ্ভব ঘটাবে সন্দেহ নেই।

এসব বিবেচনা করেই ফেকাহবিদগণ যে কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

(ইছলাহুর রূসুম–২১)

হযরত মুফতী শফী রহ. বলেনঃ এটা প্রকৃতপক্ষে একটা শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য দ্বীনী ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কায়েম রাখা এবং মানুষকে দ্বীনের আড়ালে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

হযরত উসমান গণী রা. এর একটি কীর্তি হুবহু এর দৃষ্টান্ত। তিনি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্ব সম্মতিক্রমে কোরআনের সাতটি কেরাআতের মধ্য থেকে মাত্র একটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ কোরআন সাত কেরাআতেই রাসূলুল্লাহ সা. এর বাসনা অনুযায়ী জিবরাইলের মাধ্যমে অবর্তীণ হয়েছিল। কিন্তু বর্হিবিশ্বে প্রচারিত হওয়ার পর সাত কেরাআতে কোরআন পাঠ করার ফলে তাতে পরিবর্তনের আশংকা দেখা দেয়। তখন সাহাবীগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কেরাআতে কোরআন লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। খলীফা হযরত ওসমান রা. এক কেরাআতে কোরআনের অনেক কপি লিখিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন এবং আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এর অর্থ এরূপ নয় যে অন্য কেরাআত সঠিক ছিল না। বরং দ্বীনের শৃঙ্খলা বিধান এবং কোরআনের হেফাযতের কারণে একটি মাত্র কেরাআত অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য। তাদের মধ্যে কোন একজনকে তাকলীদের জন্য নির্দিষ্ট করার অর্থ কখনও এরূপ নয় যে, যে ব্যক্তি যে ইমামের তাকলীদ করছে তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে তাকলীদের যোগ্য নয়। বরং যে ইমামের মধ্যে নিজের মতাদর্শ ও সুবিধা দেখতে পায় তারই তাকলীদ করে এবং অন্য ইমামদেরকে এমনিভাবে সম্মানিত মনে করে।

উদাহরণতঃ রোগী ব্যক্তি হাকীম ও ডাক্তাদের মধ্য থেকে কোন একজনকেই চিকিৎসার জন্যে নির্দিষ্ট করাকে জরুরী মনে করে। কারণ সে যদি নিজ মতে এক সময় এক ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করে ওষুধ পান করে এবং অন্য সময় অন্য ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করে ওষুধ পান করে তবে এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব সে যখন একজন ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্যে মনোনীত করে তখন এর অর্থ কখনও এরূপ হয় না যে, অন্য ডাক্তার পারদর্শী নয় কিংবা চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখে না।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর যে বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার স্বরূপ এর চাইতে বেশি কিছু ছিল না। একে দলাদলির রং দেয়া এবং পারস্পরিক কলহ-মতানৈক্য সৃষ্টিতে মেতে ওঠা দ্বীনের কাজ নয় এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন আলেমগণ কখানো একে সুনযরে দেখেননি। (মা'আরেফুল কোরআন)

ফায়দাঃ

আশা করি উপরের আলোচনা দ্বারা নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মানার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের দলীল এবং তার যৌক্তিকতা বুঝতে পেরেছেন। মাযহাব মানা এবং নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মানা এর কোনটিই বিদআত নয়; বরং এটা পবিত্র কোরআনের নির্দেশ। এর উপর সাহাবায়ে কেরাম হতে অদ্যাবধি বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান আমল করে আসছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত আমল করে যাবেন।

মাসআলাঃ ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব হলো কেন?

প্রিয় পাঠক! ইজতিহাদী মাসআলা নিয়েই মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে। জেনে রাখুন, যে সব বিষয়ে কোরআন ও সুন্নত থেকে শরীয়তের সুস্পষ্ট অকাট্য দলীল রয়েছে এবং যা সুস্পষ্টভাবে 'হুকুম' প্রকাশ করে, অথবা যে সব বিষয়ে সর্ববাদী সিদ্ধান্ত 'ইজমা' গৃহীত হয়েছে সে সব বিষয়ে ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই। এসব ক্ষেত্রে মাযহাবের কোন প্রশ্নই আসেনা। সব মাযহাবের ইমামদের থেকেই এই সব ব্যাপারে আপনি এক রায় পাবেন। শুকরের গোস্ত খাওয়া হালাল কি হারাম– এ প্রশ্নের উত্তরে

সব মাযহাবের ইমামদের থেকেই আপনি 'হারাম' উত্তর পাবেন। কারণ এটা কোরআনে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যে সব বিষয়ে স্পষ্ট অকাট্য কোন দলীল নেই, ইজতিহাদ কেবলমাত্র সে সব ক্ষেত্রেই করা হয়। এসব ক্ষেত্রে মত নির্ধারণে মুজতাহিদ ইমামদের বিভিন্ন মত হয়ে থাকে। এটাকে এড়িয়ে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যেমন-

ক. পবিত্র কোরআনের কোন কোন শব্দের একাধিক অর্থ থাকার কারণে অর্থ নির্ধারণে ইমামদের ইখতেলাফ হওয়া। قروء শব্দটির অর্থ حيض ও طهر উভয়ই। এ দুই অর্থের কারণে হানাফী-শায়েফীদের মাঝে দু'টি মত হওয়া।

খ. হাদীসের ইখতিলাফের কারণে ভিন্ন ভিন্ন মত হওয়া। নামাযের মধ্যে 'আমীন' জোরে বলা আর আস্তে বলার ব্যাপারে দু'রকমের হাদীস পাওয়া এবং স্বয়ং সাহাবাদের মাঝে দু'ধরণের আমল পাওয়ার কারণে ইমামদের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি হওয়া। ইত্যাদি কারণে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে।

ইজতিহাদের ব্যাপারে মুসলিমজাহানে চারজন ইমাম খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন। এ চারজনকে ঘিরেই চারটি মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে। এ চারজনের অনুসারীদেরকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত সংক্ষেপে সুন্নী মুসলমান বলা হয়।

১. ইমাম আবু হানীফা রহ. (মৃত্যু ১৫০ হিজরী, বাগদাদের কারাগারে)
২. ইমাম মালিক রহ. (মৃত্যু ১৭৯ হিজরী, মদীনা শরীফ)
৩. ইমাম শাফেয়ী রহ. (মৃত্যু ২০৪ হিজরী, মিশর)
৪. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. (মৃত্যু ২৪১ হিজরী, বাগদাদ)

এ চারজনের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম মালেক রহ. প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর ছাত্র ছিলেন। আর ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর ছাত্র ছিলেন।

নামায সংক্রান্ত

মাসআলা: নামাযের মধ্যে দু'হাত বুকের উপর বাঁধবে,না নাভির নিচে বাঁধবে?

প্রশ্ন: আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী মাযহাবভুক্ত। তারা নাভির নিচে হাত বাঁধে। মহিলারা বাঁধে বুকের উপর। কিন্তু শাফেয়ী মাযহাব ও আহলে হাদীসের লোকেরা পুরুষ ও মহিলা সবাই বুকের উপর হাত বাঁধে। এ পার্থক্যের কারণ কী?

উত্তর: মহিলাদের ব্যাপারে কোন ইখতেলাফ নেই। সব মাযহাবের মহিলারাই বুকের উপর হাত বাঁধবে। পুরুষদের ব্যাপারে ইখতেলাফ আছে এবং এই ইখতেলাফ হয়েছে হাদীসের ইখতেলাফের কারণেই। অতএব, প্রত্যেকে স্ব-স্ব মাযহাবের উপর আমল করবে। সহীহ বোখারী শরীফে এ ব্যাপারে কোন হাদীস নেই।

বুকের উপর হাত বাঁধার দলীল:

عن وائل بن حجر (رضى) قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره (أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه

অয়েল ইবনে হুজর রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি তাঁর বুকের উপর ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করলেন। হাদীসটি ইবনে খোযায়মা রহ. তাঁর 'সহীহ' কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

নাভির নিচে হাত বাঁধার দলীল:

عن أبى حجيفة عن على (رضى) بن أبى طالب أنه قال: إن من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة (رواه أحمد فى مسنده والدار قطنى ثم البيهقى)

আবু হুজায়ফা হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেন। হযরত আলী রা. বলেন, নাভির নিচে হাতের উপর হাত রাখা সুন্নত। এটা ইমাম আহমদ রহ. তাঁর মুসনাদে এবং দারাকুতনী ও বায়হাকী স্ব-স্ব কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

عن أنس (رضى) من أخلاق النبوة وضع اليمين على الشمال تحت السرة (رواه ابن حزم)

আনাস রা. বর্ণনা করেন, নাভির নিচে বাম হাতের উপর হাত রাখা নবুওয়াতের অন্যতম একটি চরিত্র। (ইবনে হাযম)

আপনারা লক্ষ্য করুন উভয় পক্ষেই হাদীস আছে। আর যখন হাদীস আছে তখন কোন পক্ষের আমলকে 'বিদআত' বলার সুযোগ নেই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাযহাব অনুযায়ী আমল করবেন।

উপরের আলোচনা বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা 'আইনীর ৫ম খন্ড ২৭৯ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

ফায়দা:

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করবেন যে, রসূলুল্লাহ সা. এ দু'ধরণের আমল কেন করলেন, যার কারণে তাঁর উম্মত আজ একই মসজিদে একই নামাযে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কেউ বুকের উপর আবার কেউ নাভির নিচে হাত বেঁধে অনৈক্য বা পার্থক্য সৃষ্টি করছে?

জওয়াবে বলব, এর রহস্য আল্লাহ ও তার রসূলই ভাল জানেন। আমাদের সীমিত ইলম দ্বারা বেশী বুঝার দরকার নেই। নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহার শেষে 'আমীন' শব্দটি জোরে না আস্তে বলা হবে– এ ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ সা. এর আমল দু'ধরণের পাওয়া যায়, যার কারণে মাযহাবের পার্থক্য হয়েছে। এর সঠিক উত্তর রাসূলুল্লাহ সা. ছাড়া অন্যরা কিভাবে দিবে? রহস্যতো তিনিই ভাল জানেন। এখন আমাদের কর্তব্য এ দু'আমলের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করা। কিন্তু তাই বলে রাসূলুল্লাহ সা. এর অপর আমলটিকে কটাক্ষ্য না করা। তাহলে রাসূলুল্লাহ সা. কেই কটাক্ষ্য করা হবে (নাউযুবিল্লাহ) অবশ্য মাযহাবের ইমামগণ হাদীস বা আমল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনেক যুক্তি পেশ করেছেন। আর তাতে দোষের কিছু নেই। যেমন এক পক্ষ বলেন, বুকের উপর হাত বাঁধার দ্বারা আল্লাহর সামনে বেশী বিনয় প্রকাশ পায়। অতএব, আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর এ আমলটাকেই গ্রহণ করব। পক্ষান্তরে অপর দল মনে করেন বুকের উপর হাত বাঁধার দ্বারা মহিলা ও বিশেষ

করে আহলে কিতাবের লোকদের সাথে মিল হয়ে যায়। আর এ 'মিল' রাখতে রাসূলুল্লাহ সা. অপর এক হাদীসে নিষেধ করেছেন।

তিনি বলেছেন- **خالفوا اليهود والنصارى والمشركين**

অর্থাৎ তোমরা ইহুদী, নাসারা ও মুশরিকদের বিপরীত আমল করবে। অতএব আমরা ইহুদীদের সাথে মিল না হওয়ার স্বার্থে রসূলুল্লাহ সা. এর নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদীসকেই গ্রহণ করব।

এখন হয়ত আপনি প্রশ্ন করবেন, তাহলে আমরা উভয় হাদীসের উপর আমল করার স্বার্থে কিছুদিন বুকের উপর আবার কিছুদিন নাভির নিচে হাত বাঁধতে পারব না কেন? জওয়াবে বলব, এটা জায়েয হবে না। কারণ সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং পরবর্তীতে মাযহাবের ইমামদের কেউই এরূপ করেননি।

মাসআলা: নামাযের মধ্যে কেউ জোরে 'আমীন' বললে কী করবেন?

প্রশ্ন: যদি কোন লা-মাযহাবী আমাদের পাশে জামায়াতে দাঁড়িয়ে রফয়ে ইয়াদাইন এবং আমীন বিল জাহর করে, তাহলে এর দ্বারা আমাদের নামায নষ্ট হবে কি না?

উত্তর ঃ

کچھ خرابي نه آئيگي۔ ایسا تعصب اچھا نهين وه بھي عامل بالحديث هے اگرچه نفسا نيت سے کرتا هو مگر فعل توفي حد ذاته درست هے.

অর্থাৎ কোন ক্ষতি হবে না। তবে এরূপ গোঁড়ামি ভাল নয়। সে-ও হাদীসের উপর আমলকারী। যদি সে কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েও করে থাকে তবুও তার কাজটি মূল্যের দিক দিয়ে ঠিক আছে। (রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রা. ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া পৃষ্ঠা ৬২/৬৩)।

মূলত: 'আমীন' জোরে বলা এবং আস্তে বলা উভয়ই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রসূলুল্লাহ সা. এর এ দু'আমলের কারণেই ইমামদের মাঝে এক্ষেত্রে দু'টি মাযহাব হয়েছে। কোন মাযহাবকে বিদয়াত বলার উপায়

নেই। এ বিভিন্নতার রহস্য আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। এখন আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে কেউ জোরে 'আমীন' বলে উঠলে আমাদের হজম করতে হবে, মন্দ বলা যাবে না। আবার দু'হাদীসের উপরও আমল করা যাবে না। আমাদের পূর্ববর্তীরা যে কোন এক হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাঁরা কখনও এক হাদীসের উপর আবার কখনও অন্য হাদীসের উপর আমল করেননি।

'আমীন' জোরে বলার দলীল:

সহীহ বুখারী শরীফে ইমাম ও মামুর(মুক্তাদী) উভয়ের জোরে আমীন বলার পক্ষে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রা. ও আবু হুরায়রা রা. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আতা রহ. বলেন-

أمن ابن زبير ومن و راءه حتى إن للمسجد للجة

ইবনে যোবায়ের 'আমীন' বললেন এবং তাঁর পিছনের লোকেরাও বললেন, এতে মসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

عن أبي هريرة (رضى) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا الخ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, যখন ইমাম **'আমীন'** বলবে তোমারাও আমীন বলবে।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইসহাক, ইমাম দাউদ রহ. প্রমুখ জোরে 'আমীন' বলার পক্ষে মত দিয়েছেন।

'আমীন' আস্তে বলার দলীলঃ

ইমাম আবু হানীফা রহ. 'আমীন' আস্তে বলার পক্ষে মত দিয়েছেন। নিজের উক্তিতে দেননি, হাদীসের ভিত্তিতেই দিয়েছেন। হাদীসটি হলো-

عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال أمين وأخفى بها صوته

আলকামা তাঁর পিতা সাহাবী অয়েল রা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়েছেন। নবী সা. যখন **غير المغضوب عليهم ولا الضالين** পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তিনি আমীন বললেন এবং আওয়াযকে

নীচু করলেন। হাকিমের বর্ণনায় আছে وخفض بها صوته মানে তিনি তাঁর আওয়াযকে নীচু করলেন।

এহাদীসটি ইমাম আহমদ, আবু দাউদ তইয়ালীসী, আবু ইয়া'লা, তাবারানী, দারাকুতনী, হাকিম প্রমুখ নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া প্রখ্যাত তাবেয়ী ইব্রাহীম নখয়ী রহ. বলেন:

أربع يخفيهن الإمام: التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وسبحانك اللهم وأمين-

চারটি জিনিস ইমাম গোপনে আদায় করবেন, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ও আমীন।

তাবারানী রহ. আবু অয়েল সূত্রে বর্ণনা করেন:

لم يكن عمر وعلى رضى الله تعالى عنهما يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بأمين-

খলীফা ওমর ও আলী রা. বিসমিল্লাহি ও আমীন জোরে বলতেন না।

হাদীস বিশারদ ওলামায়ে কেরাম বলেন, উভয় পক্ষের হাদীসই সহীহ। আর উভয় পক্ষের হাদীসের উপরই বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী আমল করেছেন। কিন্তু এক পক্ষ অপর পক্ষকে কটাক্ষ্য করেননি। বরং অপর পক্ষের হাদীসের যুক্তিপূর্ণ তাবীল বা ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র।

যেমন এক্ষেত্রে হানাফীরা বলেন, আস্তে বা নীরবে 'আমীন' বলার হাদীসটিই আমরা গ্রহণ করব। কারণ এটা পবিত্র কোরআনের অধিক নিকটবর্তী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ادعوا ربكم تضرعا وخفية তোমরা বিনয় ও নিঃশব্দে তোমাদের রবের নিকট 'দু'আ' করো। আমীন শব্দটিও যখন সকলের নিকট 'দু'আ' তখন আমীন নিঃশব্দে বা গোপনে বলাই উত্তম। রসূলুল্লাহ সা. হয়ত লোকদের তালীম দেয়ার জন্য জোরে আমীন বলেছেন, পরে ছেড়ে দিয়েছেন।

হযরত উমর ও আলী রা. এর আস্তে 'আমীন' বলার বর্ণনার দ্বারা হানাফীদের এ যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায়।

মাসআলা: রফে ইয়াদাইন নামাযেরমধ্যে কয়বার করব?

রফে ইয়াদাইনের ব্যাপারে ইমামদের মাঝে বিস্তর মতভেদ বা ইখতিলাফ রয়েছে। এ ইখতিলাফ যেহেতু রসূলুল্লাহ সা. এর আমলের ইখতিলাফের কারণেই হয়েছে, তাই এক পক্ষ অপর পক্ষকে বিদআতী বলে নিন্দা করার উপায় নেই। নিন্দা করলে তাতে খোদ রাসূলুল্লাহকেই নিন্দা করা হবে (নাউযুবিল্লাহ)। এখন রাসূলুল্লাহ সা. আমলের মধ্যে এ ইখতিলাফের রহস্য কী তা আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। আমাদের তা নিয়ে বেশী মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব মাযহাবের উপর আমল করবেন এবং অপর মাযহাবের প্রতি অসহিষ্ণু হবেন না। চারটি মাযহাবের প্রত্যেকটি মাযহাবই যেহেতু কোরআন ও হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই হুট করে মাযহাব পরিবর্তন করবেন না এবং লা-মাযহাবী হয়ে মাযহাবপন্থীদেরকে বা মাযহাবপন্থী হয়ে আহলে হাদীসকে গালাগালি দিয়ে মুসলমানদের ঐক্যকে নষ্ট করবেন না। আলোচ্য মাসআলাটির ক্ষেত্রেও আপনি দেখবেন ইমামদের বিভিন্ন মত হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও বিভিন্ন ব্যাখ্যার কারণেই হয়েছে, অথচ এতে দোষের কিছুই নেই।

এবার প্রসঙ্গে আসি। রফে ইয়াদাইন সম্পর্কে সহীহ বুখারী শরীফের একটি হাদীস প্রথমে উল্লেখ করছি-

عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه خذو منكبيه إذا افتتح الصلاة و إذا كبر للركوع و إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا و قال: سمع الله لمن حمده ربنا و لك الحمد و كان لا يفعل ذلك فى السجود-

দ্বিতীয় খলীফা উমর রা. এর নাতি সালেম রহ. তাঁর সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ রা. বলেন–

রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন যখন তিনি নামায শুরু করতেন এবং যখন তিনি রুকুর তাকবীর বলতেন। আবার যখন রুকু

থেকে মাথা উঠাতেন তখনও তিনি অনুরূপ হাত উঠাতেন এবং سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد বলতেন। কিন্তু সিজদার মধ্যে এমন করতেন না।

সহীহ বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৫৫ হিজরী, মিশর) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় রফে ইয়াদাইন সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তাকবীরে তাহরীমার সময় প্রথম রফে ইয়াদাইন সম্পর্কে যেহেতু প্রশ্ন করা হয়নি এবং সকল ইমামদের মতে এ রফে ইয়াদাইনের ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই, আপত্তি হলো নামাযের মধ্যে রফে ইয়াদাইনের ব্যাপারে। তাই রফে ইয়াদাইন সুন্নত না মুস্তাহাব ঐ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে কত বার করতে হবে তা আইনী থেকে উল্লেখ করছি।

১. রুকুর তাকবীরের সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় - এ দু'বার রফে ইয়াদাইন করা। তাকবীরে তাহরীমার সময়ের রফে ইয়াদাইন তো আছেই। এমত দিয়েছেন- ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবু সাওর, ইবনে জারীর তাবারী, এক বর্ণনা মতে ইমাম মালেক, আরও মত দিয়েছেন প্রখ্যাত তাবেয়ী হাসান বছরী, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, আতা ইবনে আবী রবাহ, তাউস, মুজাহিদ, কাসিম বিন মুহাম্মদ (হযরত আবু বকর রা. এর নাতী), সালিম (উমর রা. এর নাতী), কাতাদা মাকহুল, সায়ীদ ইবনে যোবায়ের, আবদুল্লাহ বিন মুবারক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা প্রমুখ। ইমাম বুখারী রহ. হযরত আলী রা. থেকে এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ তিনি আরও উনিশ জন সাহাবী রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা রুকুর সময় রফে ইয়াদাইন করতেন। ইমাম হাকিম এই মর্মে এমন সাহাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাদের মধ্যে দশজন বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছিলেন। আবু আলী রহ. এ মর্মে ত্রিশের অধিক সাহাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
২. কেবলমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় রফে ইয়াদইন করা। এটা ইমাম আবু হানীফার রহ. মত। এমতে রয়েছেন সুফিয়ান ছাওরী, ইব্রাহীম নখয়ী, ইবনে আবী সাবিয়ী, আলকামা ইবনে কায়স, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ, আমের শা'বী, আবু ইসহাক সাবিয়ী, খাইসামা, মুগীরা, ওকী, আসিম বিন তাইয়্যেব, যুফার, ইবনুল কাসিমের বর্ণনা মতে ইমাম মালেক প্রমুখ।
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী এই মত পোষণ করেন। সুফিয়ান ও কূফাবাসীদের মতও অনুরূপ। বাদায়ে কিতাবে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন দশজন বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীরা রা. কেবলমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময়ই রফে ইয়াদাইন করতেন, নামাযের মধ্যে আর করতেন না। এ ছাড়া আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. জাবির বিন সামুরা রা., বারা বিন আযিব রা., আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. আবু সায়ীদ রা. প্রমুখ এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর হাদীসে তাকবীরে তাহরীমার সময়ে মাত্র একবার রফে ইয়াদাইনের উল্লেখ রয়েছে। ইমাম তিরমিযী রহ. এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। কুফাবাসীদের মতও অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ সা. এর ইনতেকালের পর তখন কুফায় পনের শত সাহাবী বসবাস করতেন। তাঁরা সকলেই মাত্র একবার রফে ইয়াদাইন করতেন। কুফার পরবর্তী লোকেরা এই পনের শত সাহাবীদের থেকেই রাসূলুল্লাহ সা. এর নামায শিখেছেন।

ফায়েদাঃ উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হানাফী আলেমগণ প্রথম পক্ষের জওয়াবে দাবী করেন যে, নামাযের মধ্যে রফে ইয়াদান ইসলামের প্রথম দিকে চালু ছিল ঠিকই কিন্তু পরে মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। এর প্রমাণ−

ক) সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রা. এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে রুকুর তাকবীরের সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রফে ইয়াদাইন করতে দেখে বললেনঃ

لا تفعل فإن هذا شئ فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه —

এমন করবে না। এটা এমন একটি কাজ যা রাসূলুল্লাহ সা. প্রথমে করে পরে ছেড়ে দিয়েছেন।

(খ) ইমাম তাহাবী রহ. বর্ণনা করেন–

عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا فى التكبيرة الاولى من الصلوة.

মুজাহিদ রহ. বর্ণনা করেন, আমি ইবনে উমর রা. এর পিছনে নামায পড়লাম। তিনি তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া রফে ইয়াদাইন করেননি। তাহাবী রহ. বলেন, ইবনে উমর রা. যিনি প্রথমে রাসূলুল্লাহ সা. কে রফে ইয়াদাইন করতে দেখে নিজেও করতেন কিন্তু পরে ছেড়ে দিয়েছেন। যখন তার নিকটে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা. এটা ছেড়ে দিয়েছেন।

ভাইয়েরা, আলোচনা এখানেই শেষ করলাম। দীর্ঘ করে লাভ নেই। এটুকু করলাম শুধু আপনাদেরকে এ কথা বুঝাবার জন্য যে, মাযহাব বিভিন্ন হাদীসের ব্যাখ্যার বিভিন্নতার কারণেই রচিত হয়েছে, ইমামদের ব্যক্তিগত মনগড়া কথার ভিত্তিতে রচিত হয়নি। অতএব চার মাযহাব কোন বিদয়াত নয়। এখন আমাদের উচিত মাযহাবকে আঁকড়িয়ে ধরা। মাযহাবকে আকড়িয়ে ধরলেই কোরআন ও হাদীসকে আঁকড়িয়ে ধরা হবে। অতএব, প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাযহাব অনুযায়ী নামায পড়বেন।

মাসআলা: ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়া প্রসঙ্গে

নামায দু'প্রকার। যথা-

ক. জাহরী– যে নামাযে ইমাম প্রথম দু'রাকাআতে আওয়ায দিয়ে কিরাআত পড়ে থাকেন। যেমন মাগরিব, ইশা, ফজর, জুময়া ও দুই ঈদের নামায।

খ. সিররী-- যে নামাযে ইমাম নীরবে কিরাআত পড়ে থাকেন। যেমন যোহর ও আছর।

এখানে ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কিনা এ সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধেয় ইমামদের মত নিম্নরূপ:

১. ইমামের পিছনে সব নামাযে (জাহরী ও সিররী) মুকতাদীকে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। এটা ওয়াজিব।
এমত দিয়েছেন আবদুল্লাহ বিন মুবারক, ইমাম আওযায়ী, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইসহাক, আবু সাওর ও দাউদ রহ.।
দলীল সহীহ বুখারীর এই হাদীসঃ

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله وسلم قال لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ـــ

হযরত উবাদাহ ইবনে ছামেত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন, যে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার নামায হয়নি।

২. সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ। চাই ইমাম হোক আর মুকতাদী হোক, পুরুষ হোক আর মহিলা হোক। ফরজ, নফল সব নামাযে এবং প্রত্যেক রাকাআতে।
উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে। এমত দিয়েছেন ইবনে হাযম রহ.।

৩. ইমামের পিছনে মুকতাদীকে কোন নামাযে সূরা ফাতিহা এবং অন্য কোন সূরা বা আয়াত কিছুই পড়তে হবে না। শুধু ইমামের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে।
এমত দিয়েছেন সাওরী, এক বর্ণনা মতে আওযায়ী, ইমাম আবু হানীফা (মৃত্যু ১৫০ হিজরী, বাগদাদ) ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমদ, আবদুল্লাহ বিন ওহাব, আশআব প্রমুখ রহ.।

দলীল সূরা মুয্যম্মিলের এ আয়াত:ـــ **فاقرءوا ما تيسر من القران**

কোরআনের সহজ থেকে কিছু পড়। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

اذا قرء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ـــ

যখন কোরআন পড়া হবে তখন তোমরা চুপ করে শোন। সম্ভবত: তোমাদের উপর রহমত করা হবে।

এসব আয়াতে সূরা ফাতিহার কথা নেই এবং শ্রোতাদেরকে চুপ করে থাকতে বলা হয়েছে। এখন হাদীস যত সহীহই হোক না কেন

পবিত্র কোরআনের উপর তাকে স্থান দেয়া যায় না। বরং এ ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের মর্যাদাকে উপরে রেখে উক্ত হাদীসের তাবীল (تاويل) করতে হবে। যেমন- **لاصلواة لجار المسجد إلا فى المسجد**

মসজিদের প্রতিবেশীর মসজিদ ছাড়া নামায নেই– মানে মসজিদ ছাড়া ঘরে একা একা পড়লে নামাযের ফরজ আদায় হবে সত্য কিন্তু পূরা সওয়াব পাবে না। আর হাদীসের এ ধরনের তাবীল বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব না হলে হাদীস যত সহীহ হোক না কেন মানসুখ (রহিত) বলে পবিত্র কোরআনের মর্যাদাকে উপরে রাখতে হবে। এটা পরবর্তী যুগের ইমামদের কোন মনগড়া কথা বা বেদআত নয়, খোদ সাহাবায়ে কেরামই যাঁদের সামনে কোরআন নাযিল হত এবং যাঁদের সামনে রাসূলুল্লাহ সা. হাদীস বয়ান করতেন, তাঁরাই রাসূলুল্লাহ সা. এর অনেক সহীহ হাদীস মানসুখ করেছেন বা বর্জন করেছেন; তখন বুঝতে হবে সাহাবাদের এ কাজ রাসূলুল্লাহ সা. এর অনুমোদন ক্রমেই হয়েছে। **لأنهم كانوا أكثر علما منا ــ**

কেননা তারা আমাদের থেকে অধিক ইলম রাখতেন।

তাছাড়া হাদীস দ্বারাও হাদীস মানসুখ হয়ে যায়। যেমন আলোচ্য মাসআলাটির ক্ষেত্রেই দেখুন। এক দিকে সহীহ বোখারী শরীফের হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মুকতাদীকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়তে হবে। এমনকি ইমাম বুখারী রহ. তাঁর কিতাবে একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে-

باب وجوب القرءة للإمام و المأموم فى الصلوات كلها فى الحضر والسفر و ما يجهر فيها و ما يخافت-

ইমাম ও মুকতাদীর কিরাআত ওয়াজিব। সব নামাযে জাহরী ও সিররী, সফরে ও হজরে। আবার অন্য দিকের হাদীসঃ

من صلى خلف الإمام فقرائة الإمام قرائة له-

যে ইমামের পিছনে নামায পড়ল সে ক্ষেত্রে ইমামের কিরাআত তার কিরাআত হবে। এ হাদীসটি ছ'জন সাহাবী থেকে বর্ণিত। ইবনে মাজাহ সাহাবী জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে, দারাকুতনী ইবনে

উমর রা. থেকে, তাবরানী আবু সায়ীদ রা. থেকে, দারাকুতনী আবু হুরায়রা রা. থেকে, দারাকুতনী ইবনে আব্বাস থেকে, ইবনে হিব্বান হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন।

এ ছাড়া আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. রচিত **عمدة القارى** (উমদাতুল কারী) কিতাবের ৬ষ্ঠ খন্ডের ১৩ পৃষ্ঠায় আরও লেখা আছে যে, আশি জন বড় বড় সাহাবী আছেন যাঁরা ইমামের পিছনে মুকতাদীকে কিরাআত পড়তে নিষেধ করেছেন। যেমন আলী মুরতাজা, আব্দুল্লাহ নামের তিনজন সাহাবী রা. প্রমুখ। এর ভিত্তিতে হেদায়া গ্রন্থকার এ ব্যাপারে সাহাবীদের 'ইজমা' হওয়ার দাবী করেছেন। শায়খ ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ইয়াকুব রহ. তাঁর **كشف الأسرار** (কাশফুল আসরার) নামক কিতাবে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তে নিষেধ করেছেন। তাঁরা হলেন ঃ আবু বকর রা. উমর রা. উসমান রা. আলী রা. আবুদর রহমান বিন সাবিত রা. আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. ও আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.।

ইমাম তাহাবী রহ. বলেন, এ হল সাহাবীদের জামায়াত যাঁরা ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাআত বর্জনের উপর ইজমা করেছেন, মানে একমত হয়েছেন।

ফায়দা: ইচ্ছা করলে উভয় পক্ষের দলীল এবং পাল্টা দলীল উল্লেখ করে আলোচনা দীর্ঘ করা যেত, কিন্তু লাভ কি!

উপরের এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা একটা কথা বুঝে নেয়াই উদ্দেশ্য। আর তা হল- মাযহাবের ইমামগণ পবিত্র কোরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধে নিজেদের থেকে কোন মনগড়া কথা বলে যাননি, মাযহাবের বিদাআত সৃষ্টি করে মুসলমানদের নামায বরবাদের ব্যবস্থা করে যাননি (নাউযুবিল্লাহ)। তারা যা কিছু করেছেন পবিত্র কোরআন-হাদীসকে কেন্দ্র করেই করেছেন। তাঁরা ইজতিহাদ-কিয়াসের উসূলের ভিত্তিতে কোরআন হাদীসের মাসআলাগুলিকে আমাদের জন্য সাজিয়ে-গুছিয়ে সহজ করে দিয়েছেন। আমাদের অন্তর থেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে

দিয়েছেন। তারা সাহাবীদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন অথবা সাহাবীদের কাছা-কাছি যুগের লোক ছিলেন বিধায় মনের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর সাহাবী অথবা সাহাবীদের সাহচর্যপ্রাপ্ত তাবেয়ীদের নিকট থেকে নিতে পেরেছিলেন। এ জন্য মাযহাবের ফায়সালা কোরআন-হাদীসভিত্তিক ফায়সালা। এতে কোন ইমামের নফসানিয়াত বা কুপ্রবৃত্তির স্থান নেই। স্বয়ং নবী করীম সা. তাদের উত্তম হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেন--خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

অর্থাৎ উত্তম যুগ তিনটি। নবীর যুগ, সাহাবীদের যুগ ও তাবেয়ীনের যুগ। এ তিন যুগের পরবর্তী যুগের লোকদের উত্তম হওয়ার সাক্ষ্য মহানবী সা. দিয়ে যাননি। অতএব এ উত্তম যুগের লোকদের ইজতিহাদ আমাদের জন্য আল্লাহর এক বিরাট রহমত।

আপনি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, আপনি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বেন কি পড়বেন না এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিতেন? যে সিদ্ধান্তই নিতেন মনের দুর্বলতা দূর হত না। আর এখন মাযহাবের সিদ্ধান্ত মানার ফলে আপনি মনের দিক দিয়ে চিন্তামুক্ত হতে পারেন। চিন্তামুক্ত এক প্রশান্ত মন নিয়ে আল্লাহর বন্দেগী করতে পারেন। কারণ মাযহাবের এ রায়ের পিছনেও নবীর হাদীস ও সাহবীদের আমল আছে, যেমন অন্য মাযহাবের রায়ের পিছনেও নবীর হাদীস ও সাহাবীদের আমল আছে। আর নবীর হাদীস ও সাহবীদের আমলই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন হাদীসের রহস্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

এখন যদি কেউ বুখারীর হাদীসের দোহাই দিয়ে বলে যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার কারণে হানাফী মাযহাবপন্থীদের নামায হয়নি, তদ্রুপ হানাফীরাও যদি কোরআন শরীফের 'কিরাআতের সময় চুপ করে শোন' এবং 'ইমামের কিরাআতই মুকতাদীর কিরাআত' তদুপরি সাহাবীদের আমল ইত্যাদির ভিত্তিতে শাফেয়ী বা মালেকীদের নামায বাতিল করে দেয় তাহলে আপনারাই বলুন আমাদের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? আর এর দ্বারা কি তারা প্রকারান্তরে খোদ রাসূলুল্লাহর নামাযকেই বাতিল বলে ঘোষণা দেয় না? সে সমস্ত সাহাবা, তাবেয়ীন ও

ইমামগণ যাঁদের নাম আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যাঁরা মুকতাদীর জন্য ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার রায় দিয়েছেন এবং যে রায়ের উপর আজ দেড় হাজার বছর ধরে বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান নামায পড়ে আসছেন, তাদের সকলের নামায কি বরবাদ? (নাউযুবিল্লাহ)

হ্যাঁ, ইসলামের দুশমন ইহুদী-নাসারা-মুশরিকরা এটাই চায়। তারা চায় যে, মুসলমানরা দ্বীন কায়েম করার নামের আড়ালে মাযহাব কায়েম করুক। কারণ দ্বীন কায়েমের প্রতিপক্ষ ইহুদী-নাসারা-মুশরিক ও মুসলিম জাহানের মুসলমান নামধারী মুরতাদ সরকারগুলি। আর মাযহাব কায়েমের প্রতিপক্ষ এক মুসলমানের বিরুদ্ধে আরেক মুসলমান। এ কারণে তারা দ্বীন কায়েমের জিহাদকে ধ্বংস করতে চায়, পক্ষান্তরে মাযহাবী বিতর্ককে মুসলমানদের মাঝে জিয়িয়ে রাখার জন্য কাদিয়ানী, কট্টর লা-মাযহাবী ইত্যাদিসহ বিভিন্ন সংগঠন, দরবার ও ব্যক্তিকে গোপনে/প্রকাশ্যে সহায়তা দিয়ে থাকে।

অতএব আজকে যারা মাযহাব নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করবে তাদের পিছনে ইসলামের বড় দুশমন আমেরিকার গোপন সহায়তা আছে কিনা অনুসন্ধান চালাতে হবে। এক কথায় বলতে চাই- আজ যারা দ্বীন কায়েমের জিহাদ-কিতাল নামের আড়ালে মাযহাবের ইমামগণকে গালা-গালি দেয়, কর্মীদেরকে কট্টর লা-মাযহাবী বানাতে চায় তারা হয় অজ্ঞ, না হয় ইসলামের দুশমনদের হাতের পুতুল।

আল্লাহ তায়ালা সকল হানাফী, শাফেয়ী, শিয়া, সুন্নী, আহলে হাদীস প্রভৃতিকে মাযহাব কায়েমের জন্য নয়, দ্বীন কায়েমের জিহাদে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের বড় দুশমন আমেরিকা এবং আমেরিকার দালাল মুসলিম জাহানের মুরতাদ সরকারগুলির বিরুদ্ধে কাজ করার তাওফীক দান করুক। আমীন

পরিশিষ্ট

অত্র কিতাবে উল্লিখিত পরিভাষিক শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

সহীহ: ঐ হাদিস কে বলা হয়, যা মুসনাদ হবে, যার সনদ মুত্তাসিল হবে, যার রাবী আদেল হবে, যাবেত হবে এবং সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এসব বৈশিষ্টাবলী অব্যাহত থাকবে। সাথে সাথে হাদিসটি শাযায়ও হবে না, মুআল্লালও হবে না। (মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ)

মারফু' ও মুসনাদ: হাকেম ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন-মুসনাদ হল ঐ হাদীস যা সরাসরি রাসুল সা. এর প্রতি নিসবত করা হয়। (প্রাগুক্ত) এ অর্থে মুসনাদ ও মারুফু' সমার্থবোধক। অর্থাৎ রাসূল সা. এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীসে মুসনাদ বা মারফু' বলা হয়।

মুত্তাসিল: যে হাদিসের প্রত্যেক রাবী তার উস্তাদ থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন।

রাবী : হাদীসের বর্ণনাকারীকে রাবী বলা হয়।

আদেল: এমন রাবী–যিনি মুসলমান, আকেল (বিবেকসম্পন্ন) ও বালেগ (তথা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন) হবেন এবং ফাসেক হবেন না।

যাবেত: যিনি সংরক্ষন ক্ষমতা সম্পন্ন, চাই স্মৃতির মাধ্যমে হোক বা লিখার মাধ্যমে হোক।

শায না হওয়া: মানে কোন নির্ভরযোগ্য রাবী তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীত রেওয়াত না করা।

মুআল্লাল না হওয়া: মানে সূক্ষ্ম ত্রুটিযুক্ত না হওয়া।

মোট কথা যে হাদীসের মাঝে উল্লিখিত পাঁচটি শর্ত একত্রিতভাবে পাওয়া যায় তাকে সহীহ হাদীস বলে।

হুকমী মারফু : যে হাদীস সরাসরি রাসূল সা. এর প্রতি নিসবত করা হয় নি।কিন্তু বিষয়বস্তু এমন যে কোন সাহাবীর পক্ষে এ ব্যাপারে নিজ থেকে কিছু বলা সম্ভব নয়।এ ধরণের হাদীসকে হুকমী মারফু হাদীস বলা হয়।

সিহ্যত: হাদীস সহীহ হওয়া।

যয়ীফ: যে হাদীসের মাঝে উল্লিখিত পাঁচটি শর্তের সবগুলো বা কোন একটি পাওয়া যায়না, তাকে হাদীসে যয়ীফ বলে।

যুয়ফ: হাদীস যয়ীফ হওয়া।

মওকুফ: সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজকে হাদীসে মওকুফ বলা হয়।

মুযতারাব: যে হাদীসের সনদ বা মতন নিয়ে রাবীগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

রাজেহ ও মারজুহ: দু' রেওয়াতের মাঝে অগ্রগণ্য রেওয়ায়েতটিকে রাজেহ এবং অপর রেওয়ায়েতটিকে মারজুহ বলা হয়।

সাহেবাইন: ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. কে একত্রে সাহেবাইন বলা হয়।

মুত্তাফাক আলাই: যে হাদীসকে সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আহলে হাদীসের লিফলেটও আদিল্লায়ে কামেলা'য় অভিধানিক অর্থ উদেশ্য। অর্থাৎ এমন হাদীস যার সিহ্যত নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই।

যাহিরুর রেওয়ায়েত: ইমাম মুহাম্মদ রহ. লিখিত ছয় কিতাব (তথা জামেয়ে সগীর, জামেয়ে কাবীর, সিয়ারে সগীর, সিয়ারে কাবীর, মাবসূত ও যিয়াদাত) এর রেওয়াতেকে যাহিরুর রেওয়ায়েত বলা হয়।

ছায়ায়ে আছলী:কোন বস্তুর ঠিক দ্বিপ্রহর কালীন ছায়াকে ছায়ায়ে আছলী বলা হয়।
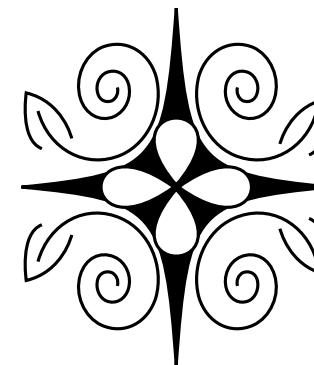
বরেণ্য আলেম ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা

আল্লামা মোস্তফা নোমানী দা: বা: রচিত কয়েকটি **তোহফাহ:**

- ✓ পর্দা পালন ও প্রচলিত মহিলা মাদ্রাসা
- ✓ হারাম থেকে বাঁচার উপায়
- ✓ আল্লাহকে পাওয়ার পথে মোমেনের সাধনা
- ✓ মুসলমানদের কতিপয় করণীয় ও বর্জনীয় আমল
- ✓ একশত মাসআলা শিক্ষা (প্রথম খন্ড)
- ✓ একশত মাসআলা শিক্ষা (দ্বিতীয় খন্ড)
- ✓ একশত মাসআলা শিক্ষা (তৃতীয় খন্ড)
- ✓ একশত মাসআলা শিক্ষা (চতুর্থ খন্ড)
- ✓ কারাবাসের পঞ্চাশ দিন
- ✓ আহলে হাদীসের বিভ্রান্তির জবাবে চার মাযহাবের আলোকে শরয়ী নামায

প্রাপ্তিস্থান ও যোগাযোগ:

মাকতাবায়ে নো'মানীয়া	**ইব্রাহীম বইঘর**
দিবা মাইঠা চৌমোহনী	গোলাম সরোয়ার রোড
বরগুনা সদর	(সদরঘাট মসজিদ সংলগ্ন)
০১৯১৮-০০৪৩৮৩	বরগুনা সদর
০১৭৬৫-৫১১১৩১	০১৯২৩-২০২১৯৬

অচিরেই প্রকাশিত হচ্ছে

আহলে হাদীস মতবাদ ও ইজতিহাদে ফুকাহা রহ.

মূল:আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ.

অনুবাদ: রুহুল্লাহ নোমানী

আপনার মন্তব্য